শ্রীসুকুমার সেন
প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬২

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্র ভবন ৩৫ ফিরোজশাহ রোড নয়াদিল্লী ১
ব্লক ৫বি রবীন্দ্র স্টেডিয়াম কলিকাতা ২৯
২১ হ্যাডোস রোড মাদ্রাজ
৭২ নইগাঁও ক্রশ রোড বোম্বাই ১৪

প্রচ্ছদ : শ্রীঅধর লস্কর

শ্রীঅপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম. এ. কর্তৃক গ্রন্থপরিষদ প্রেস ৩০/১বি কলেজ রো কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত
সাহিত্য অকাদেমি নয়াদিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত

অপরিকলিতপূর্বং যশ্‌ চমৎকারকারী
হাস্কৃত সুভগম্ এতন্ মঙ্গলং চিত্রগীতম্ ।
ভুবিচরদিবিষদ্‌ভিস্ সঙ্গতং বৈ বনান্তে
সহৃদরসুমনোভির্ বন্দনীয়ো মুকুন্দঃ ॥

অগ্রেসরতরশ্‌ চাস্মিন্ কর্তব্যো নবকর্মণি ।
অম্বিকাচরণোপান্তে গুপ্তায় মামকী নতিঃ ॥

অহর-অকির-রাধাকৃষ্ণজুষ্টে সুশিষ্টে
সদসি শিরসি ধার্যে বাগ্‌বিধৌ ভারতীয়ে ।
দিশি দিশি শ্রুতকীর্তিং শ্রীসুনীতিং দ্বিজাগ্র্যম্
অপি চ রসিকবর্গং যাচে তে হর্ষিষুবন্তু ॥

সুহৃত্তাম্ ঈপ্‌সমানেন
কুশলং সমবাপ্তয়ে ।
মানসং তদ্ ইদং প্রীতি-
রসেন সফলং কৃতম্ ॥

বেদাঙ্গনিধিবিদ্যাঙ্ক-সমায়াং শকভূপতেঃ ।
কৃতিম্ এষা মুকুন্দস্য প্রণীতা নবকর্মণা ॥

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা—আমার দেখা পুথির মধ্যে তারিখযুক্ত প্রাচীনতম—চণ্ডীমঙ্গলের পুথি অবলম্বনে এই সংস্করণের পাঠ গৃহীত হইয়াছে। সংস্করণটিকে একটি **definitive edition** ধরা যাইতে পারে। গৃহীত পাঠই যে মুকুন্দের কাব্যের মূল পাঠ সে দাবি করি না, করাও যায় না। তবে মুকুন্দের কাব্যের মূল রূপ সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তভাগে কেমন দাঁড়াইয়া ছিল তাহার স্পষ্ট ধারণা ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। ভাষায়, বিশেষ করিয়া শব্দ ব্যবহারে, প্রাচীনত্ব পরিস্ফুট। রচনার মধ্যে পরিবর্জনের চিহ্ন আছে, তাহা পাঠান্তরে দেখানো গিয়াছে। অল্পস্বল্প পরিবর্তনের ইঙ্গিতও আছে, তাহা মন্তব্যে দেখাইয়াছি।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর মূল পাঠ আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় আমি প্রায় চল্লিশ বছর ধরিয়া নিযুক্ত ছিলাম। ১৯৬৪ সালের আগে পর্যন্ত এ কাজে ধারাবাহিক মনঃসংযোগ করিতে পারি নাই। সাহিত্য অকাদেমির উদ্যোগে, বিশেষ করিয়া তদানীন্তন সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনির উৎসাহে, কয়েক বছর ধরিয়া একটানা মনঃসংযোগ করিয়া কাজটি শেষ করিতে পারিয়াছি। বলা বাহুল্য মুকুন্দের কাব্যের মূল রূপ আবিষ্কার করিতে পারি নাই, তবে সে রূপ যে কেমন ছিল তাহার আদল প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করি। এই সংস্করণ পড়িলে কাহার কতটুকু লাভ হইবে তাহা বলিতে পারি না, শুধু বলিব যে চণ্ডীমঙ্গল ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া আমার লাভ হইয়াছে এইটুকু জ্ঞান যে রবীন্দ্রনাথের আগে এমন দক্ষতায় আমাদের ভাষা আর কোন লেখক বিশুদ্ধ সাহিত্যরচনায় ব্যবহার করেন নাই।

চণ্ডীমঙ্গলের পাঠসমাধানে হাত দিয়া আমি শিল্পী-শ্রেষ্ঠ নন্দলাল বসু মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম তাঁহার গুরু অবনীন্দ্রনাথের মতো তিনিও যেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দের কাব্যকাহিনী অবলম্বনে দুই একটি ছবি আঁকিয়া দেন। (ইতিপূর্বে তিনি বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিত রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাহিনীর কয়েকটি ছবি অনুগ্রহ করিয়া আঁকিয়া দিয়াছিলেন, সেই সাহসে এই অনুরোধ করিয়াছিলাম।) তাঁহার অঙ্কিত সেই ছবিগুলি এই গ্রন্থের মর্যাদা বাড়াইয়াছে।

পুথি মিলাইবার কাজে আমি নানা সময়ে দুই চার জনের কাছে অল্পস্বল্প সাহায্য পাইয়াছিলাম। তাহা আমি স্মরণ করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজ আমাকে একলাই চালাইতে হইয়াছে। সুতরাং বইটির দোষ ত্রুটির দায়িত্ব আমারই। কাজটি শেষ করিতে যত না কষ্ট করিয়াছি তাহার চতুর্গুণ উদ্বেগ পাইয়াছি প্রকাশপ্রযত্নে। যাই হোক, সব ভালো যার শেষ ভালো॥

সূচীপত্র

ভূমিকা ১—৩৬

চণ্ডীমঙ্গল

প্রথম দিবস : দিবা

স্থাপনা : বন্দনা ১ কবিত্বের বিবরণ ৩

প্রথম দিবস : নিশা

দেব-খণ্ড : আবাহন ও সৃষ্টিকথা ৫ সতীর কথা ৮ উমার কথা ১৪

দ্বিতীয় দিবস : দিবা

দেব-খণ্ড : উমার সংসার ২৪ উমার সংসারত্যাগ ২৭ কলিঙ্গ-অরণ্যে প্রতিষ্ঠা ২৮ নীলাম্বরের শাপপ্রাপ্তি ৩২

আখেটিক-খণ্ড : কালকেতুর জন্ম ৩৮

তৃতীয় দিবস : দিবা

আখেটিক-খণ্ড : কালকেতুর বিবাহ ৪২ কালকেতুর সংসার ৪৪ অরণ্যে পশুর দুরবস্থা ৪৯ কালকেতুকে দেবীর ছলনা ৫৩ কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি ৬৩

তৃতীয় দিবস : নিশা

আখেটিক-খণ্ড : গুজরাট-স্থাপনের উদ্যোগ ৬৪ নগরস্থাপন ৭৫

চতুর্থ দিবস : দিবা

আখেটিক-খণ্ড : ভাঁড়ুদত্ত ৮২ গুজরাট আক্রমণ ৮৬ কালকেতুর পরাজয় ও বন্ধন ৯৩ পরিত্রাণ ৯৯ নীলাম্বরের শাপমোচন ১০৫

চতুর্থ দিবস : নিশা

বণিক-খণ্ড : রত্নমালার শাপপ্রাপ্তি ১০৮ খুল্লনার জন্ম ১০৯ পায়রা-বাজি ১১১ খুল্লনার বিবাহপ্রস্তাব ১১২ বিবাহ ১১৯ শুক-সারির কথা ১২০ ধনপতির গৌড়-যাত্রা ১২৭

পঞ্চম দিবস : দিবা

বণিক-খণ্ড : খুল্লনার নির্যাতন ১২৮ ছাগল চরানো ১৩৬ দেবীর অনুগ্রহ ১৪১

পঞ্চম দিবস : নিশা

বণিক-খণ্ড : ধনপতির প্রত্যাবর্তন ১৪৮ সংসারসুখ ১৫৪

ষষ্ঠ দিবস : দিবা

বণিক-খণ্ড : খুল্লনার উৎসব ১৬৮ মালাধরের শাপপ্রাপ্তি ১৭০ লজ্জাতির ঘোঁট ১৭৩ খুল্লনার পরীক্ষা ১৮০ ধনপতির সিংহলযাত্রার প্রস্তাব ১৮৭

ষষ্ঠ দিবস : নিশা

বণিক-খণ্ড : ধনপতির সিংহলযাত্রা ১৯২ পথের অভিজ্ঞতা ১৯৬ কমলে-কামিনী দৃশ্য ২০০ ধনপতির নিগ্রহ ২০৬ শ্রীপতির জন্ম ২০৯

সপ্তম দিবস : দিবা

বণিক-খণ্ড : শ্রীপতির বালাকথা ২১১ সিংহল-যাত্রার উদ্যোগ ২২২

সপ্তম দিবস : নিশা—জাগরণ

বণিক-খণ্ড : শ্রীপতির সিংহল-যাত্রা ২২৮ সপ্তগ্রাম অবধি পথ ২২৯ সপ্তগ্রাম হইতে মগরা ২৩২ সগর-বংশের উপাখ্যান ২৩৪ নীলগিরির কথা ২৩৮ সেতুবন্ধের ঘটনা ২৩৯ সেতুভঙ্গের ঘটনা ২৪২ কমলে-কামিনী দৃশ্য ২৪২ সিংহলে শ্রীপতির নিগ্রহ ২৫০ শ্রীপতির পরিত্রাণে দেবীর উদ্যোগ ২৫৫ সিংহলের রাজার নতিস্বীকার ২৬৫

অষ্টম দিবস : দিবা

বণিক-খণ্ড : ধনপতির উদ্ধার ২৭৫ পিতাপুত্রের মিলন ২৭৮ রাজকন্যার সহিত বিবাহ ২৫১ দেশে ফিরিবার ব্যাকুলতা ২৮২ সিংহল-ত্যাগ ২৮৮ দেশে প্রত্যাবর্তন ২৯১ রাজসভায় সঙ্কট ২৮৫ দেবীর আনুকূল্য ও শ্রীপতির দ্বিতীয় বিবাহ ২৯৩ প্রথম পত্নীর দুঃখ ২৯৬ অষ্টমঙ্গলা ২৯৭ কলিকালের পাপাচার ২৯৯ হরিনাম-মাহাত্ম্য ৩০০ খুল্লনার ও সস্ত্রীক শ্রীপতির শাপমোচন ৩০১ দেবীর কৈলাসে প্রত্যাবর্তন ৩০২

পরিশিষ্ট

গঙ্গা-বন্দনা ৩০৫

পাঠান্তর ও মন্তব্য

রাম-বন্দনা ৩০৮ সদাশিব-বন্দনা ৩০৬ ভগবতী-বন্দনা ৩০৭ শুকদেব-বন্দনা ৩০৮ দিক্-বন্দনা ৩০৮ সূর্য-বন্দনা ৩১০ বংশ-পরিচয় ৩১১ দক্ষযজ্ঞের পর ৩১৪ শিবের ধামালি ৩১৬ বিজু-বন পত্তন ৩১৮ ইন্দ্রের শিব-পূজা ৩১৯ কালকেতুর মৃগয়া ৩২০ পশুগণের গোহারি ৩২১ প্রতিকার ৩২২ কালকেতুর হতাশা ৩২৩ দেবীর শতনাম ৩২৫ কালকেতুর ভক্তি ৩২৬ হাট হইতে দ্রব্য আনয়ন ৩২৭ বেরুনিয়াদের নাম ৩২৭ বন-কাটা ৩২৮ কালকেতুর যুদ্ধসজ্জা ৩৩২ কালকেতুর যুদ্ধ ৩৩৩ পায়রার তালিকা ৩৩৫ সারির খেদ ৩৩৬ প্রহেলিকা ৩৩৮ খুল্লনার সন্তাপ ৩৪০ ধনপতির গৃহপ্রত্যাগমন ও বিস্ময় ৩৪১ খুল্লনার স্বামিসন্দর্শন ৩৪১ পলো পরীক্ষা ৩৪৫ জোঁধর ৩৪৬ খুল্লনার অরুচি ৪৪৮ সাধ-ভক্ষণ ৪৪৯ সাধে উপহার ৪৫০ লহনার ক্ষোভ ৪৫০ শ্রীমন্তের শিক্ষা ৪৫১ শ্রীমন্তের পিতৃদর্শনেচ্ছা ৪৫২ উজানি-সিংহল যাত্রাপথ ৩৫৩ শ্রীমন্তের টোপর ফেলা ৩৫৪ বাঙ্গাল-কাঁদন ৩৫৬ শ্রীমন্তের চৌতিশা ৩৫৭ পিতাপুত্রের মিলন ৩৫৯ গজেন্দ্র-মোক্ষণ ৩৬০ বিষ্ণুদূত-যমদূতের ঝগড়া ৩৬০ কৈলাসে রিপোর্ট ৩৬১ আদর্শ পুথির পুষ্পিকা ৩৬২ ফলশ্রুতি ৩৬৩

শব্দার্থ ৩৬৫

চিত্র-সূচী

১ আদর্শ পুথির একটি পৃষ্ঠা
২ মাধবপুর পুথির একটি পৃষ্ঠা
৩ মাধবপুর পুথির আর একটি পৃষ্ঠা
৪ কালিকাপুর পুথির একটি পৃষ্ঠা
৫ কালিকাপুর পুথির আর একটি পৃষ্ঠা
৬ নন্দলাল বসু অঙ্কিত। 'চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে'
৭ নন্দলাল বসু অঙ্কিত। 'হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা'
৮ নন্দলাল বসু অঙ্কিত। 'নবদলে শশিমুখী - উগারি গিলিছে করিবরে'
৯ একটি চিত্রিত পুথির পৃষ্ঠাংশ। 'ছাগ রাখা খাই ভাত'
১০ রামজয়-সংস্করণের চিত্র। 'নিজ মূর্তি ধরিতে অভয়া কৈল মন'
১১ রামজয়-সংস্করণের চিত্র। 'কমল কুঞ্জর কান্তা দেখি সদাগর'
১২ রামজয়-সংস্করণের চিত্র। 'হাথে হাতে শ্রীমন্তে করিল সমর্পণ'
১৩ রামজয়-সংস্করণের চিত্র। 'ধীরে ধীরে জায় রামা লইয়া ছাগল'
১৪ রামজয়-সংস্করণের চিত্র। 'শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বসিলা ভবানী'

ভূমিকা

১

পাঠ ও পাঠোদ্ধার

কালিদাসের কাব্যের অনেক ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। তবুও কেন যে মল্লিনাথ সঞ্জীবনী টীকা লিখিতে গেলেন তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। ১৭৪৫ শকাব্দ (১৮২৩-২৪) থেকে এ পর্যন্ত কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যের অনেক "সংস্করণ" বাহির হইয়াছে, তবুও কেন যে এই পাঠ (অর্থাৎ সংস্করণ) প্রস্তুত করিলাম তাহার কৈফিয়ৎ আমিও দিই। আমার প্রচেষ্টা দুর্ব্যাখ্যা-বিষমূর্ছা থেকে উদ্ধার নয়, দুষ্পাঠের কুয়াসা-ঘোচানো এবং কুপাঠের জঞ্জালমোচন।

এই প্রায় দেড় শ বছরের মধ্যে মুকুন্দের কাব্য অনেকবার মুদ্রিত হইয়াছে, প্রচলিত কথায় বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে। কিন্তু এগুলির মধ্যে দুই তিনটি ছাড়া কোনটিরই পাঠ অনেক ক্ষেত্রেই সংশয়মুক্ত নয়, কখনো কখনো একেবারে অবোধ্য। বোঝা যায়, সে সব ছাপা গ্রন্থের পাঠ প্রয়োজন মতো পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। দুই একটি ছাড়া কোন সংস্করণই একটি-দুইটি নির্দিষ্ট পুথির উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তুত বলিয়া উল্লিখিত নয়, এবং সে দুই-একটি সংস্করণেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের পুথির পাঠই প্রদত্ত হইয়াছে। অবশ্য একথা মানিতে হয় যে পুথি অর্বাচীন হইলেই যে পাঠ অর্বাচীন সুতরাং আগ্রাহ্য হইবে এমন কথা নয়। কোন পদে কোন শব্দের বা শব্দাবলীর আধুনিক বানান দেখিলেই যে তাহা সরাসরি পরিত্যাগ করিতে হইবে তাও বলা চলে না। কিন্তু এমন অনেক পাঠ পাওয়া যায় যা আপাতদৃষ্টিতে নবীন নয় অথচ আসলে অত্যন্ত আধুনিক। গায়কের (চণ্ডীমঙ্গলের ভালো পুথিগুলি অধিকাংশ গায়কের প্রয়োজনে লেখা,) অথবা লিপিকরের (চণ্ডীমঙ্গলের পুথি যাঁহারা লিখিতেন তাঁহারা নিতান্ত মূর্খ ছিলেন না,) অজানা শব্দ সঙ্গত কারণেই পুথিতে প্রচলিত অথবা অনুমিত প্রতিশব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই সব অজ্ঞান-জনিত বিকৃতি ও পরিবর্তন, প্রামাণিক পাঠ পাইলে, অগ্রাহ্য করিতে হয়। একটা উদাহরণ দিই। যে ডাবরে (আশা করি তরল দ্রব্যের আধার ধাতুপাত্র "ডাবর" এখনই অপরিচিত হইয়া পড়ে নাই,) অনেক সময় কুলকুচা করা হইত অথবা উদ্‌গার ফেলা হইত বলিয়া সেই কাজে তাহা ষোড়শ শতাব্দীতে "উলটি ডাবর" (অথবা "আলবাটি") নামে উল্লিখিত হইত। এখানে "উলটি" শব্দের অর্থ সংস্কৃত "উদ্‌গীর্ণ"। শব্দটির আরও একটি আনুষঙ্গিক এবং বহুব্যবহৃত অর্থ ছিল "পরিবর্তিত"। পরবর্তী কালের গায়ক-লিপিকরের প্রথম অর্থটি জানা ছিল না দ্বিতীয়টি ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় অর্থটিকে এখানে খাপখাওয়ানো যায় না। সুতরাং সকলের বুঝিবার জন্য "উলটি" পরিবর্তিত হইল সমার্থক "ফিরিয়া" দিয়া।/ আহারের পর "ফিরিয়া ডাবরে সাধু কৈল আচমন," এই পাঠ পুথিতে ও ছাপা বইয়ে যথেষ্ট মিলিয়াছে। ভালো কোন কোন পুথিতে এবং সংস্করণে খাঁটি পাঠ পাই—"উলটি ডাবরে সাধু কৈল আচমন"। (উলটি বিশেষণ দিবার কারণ ছিল, ডাবরের মতো আধারে ডাল ও অন্য তরল ব্যঞ্জনও ঢালা হইত।) আধুনিক কালের ছাপমারা "পণ্ডিত" ব্যক্তি সম্পাদিত কোন কোন সংস্করণেও পাঠভ্রান্তির ফলে বিচিত্র বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন, কোন এক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত সংস্করণে ছাপা হইয়াছে, শিশু শ্রীপতির শৈশববেশের বর্ণনায়—"বর্ণমালা দোলে গলে"। সম্পাদকের খেয়াল হয় নাই যে সেকালে কিণ্ডারগার্টেন ছিল না, সুতরাং বর্ণমালা লইয়া খেলাধূলার সৃষ্টি হয় নাই, গলায় বর্ণমালার (alphabet) মালা দোলানো তো দূরের কথা (বোধ করি এ বিচিত্র ভাবনা এখনো কোন শিশুশিক্ষা-বিশারদ পণ্ডিতের মনে উদিত হয় নাই)। আসলে পাঠ

হইল "বনমালা দোলে গলে"। বনমালা মানে "বনমালা"।[1] বাংলা পুথি পড়ায় যাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা জানেন যে 'ন্য, ণ্য, র্ণ' তিনটি অক্ষরই লিপিকরের কলমে একই রূপ পাইত—"ন্তু, ন্তু"।

কবিকঙ্কণ-চক্রবর্তী মুকুন্দ[2] প্রাচীন কবি। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। কবির জীবৎকালে অবশ্যই তাঁহার কাব্য সাদরে বহুবার গীত এবং অনুলিখিত হইয়াছিল। কাব্যটির সমাদর কালক্রমে বাড়িয়াই গিয়াছিল—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অবধি। একারণে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের পুথি দুর্লভ নয়। তবে আফশোসের বিষয় এই যে প্রাপ্ত পুথির পনের আনারও বেশী ভাগই অল্পবিস্তর খণ্ডিত, সুতরাং অসম্পূর্ণ। পুথির শেষপাতা না থাকিলে লিপিকাল জানা যায় না। কোন কোন পুথিতে আবার লিপিকালের উল্লেখ নাই। এমন অবস্থায় পুথির লিপিকাল-নির্ণয় অনুমানসাধ্য হয়। সে অনুমান নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর,—লিপিছাঁদ, কাগজের প্রকৃতি ও উপাদান, এবং কালির রঙ ও তরলতা। বাংলা অক্ষর ষোড়শ-সপ্তদশ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত—অর্থাৎ ছাপার অক্ষর পরিচিত হইবার আগে পর্যন্ত—আঞ্চলিক ও ব্যক্তিগত লেখনী-চালনার ভঙ্গি স্বীকার করিলেও—প্রায় একই ছাঁদের ছিল, এবং প্রযত্নে লেখার ও অযত্নে লেখার বিভিন্ন ছাঁদ যুগপৎ চলিত ছিল। সুতরাং লিপিছাঁদের উপর খুব নির্ভর করা যায় না। তবে কাগজের উপর কিছু পরিমাণে নির্ভর করা যায়, কেননা পাতলা মাড়ের কাগজ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের আগে দেখা যায় নাই এবং উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতেই কলের কাগজ ব্যবহারে আসিয়াছিল। কালির ঔজ্জ্বল্য ও জলীয়তা ধরিয়া অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর পার্থক্যবিচার করা যায় না। সুতরাং লিপিকাল না থাকিলে পুথির প্রাচীনত্ব নিঃসন্দিগ্ধ নয়।

দীর্ঘকাল ধরিয়া কবিকঙ্কণের কাব্যের পুথির সন্ধানে ও তাহার অনুশীলনে ব্যাপৃত আছি। সমসাময়িক পুথি নাই, সুতরাং মূল পাঠে পৌঁছিবার সরাসরি উপায় নাই। অতএব এখন আসল পাঠ উদ্ধারের কথা উঠে না। আমি চেষ্টা করিয়াছি—প্রাপ্ত পাঠাবলির মধ্যে প্রাচীনতম পাঠ কল্পনা করিতে নয়, নির্ণয় করিতে। আপাতত তাহাতেই খাঁটি পাঠের কাজ চালাইতে হইবে। আমার সন্ধানে যে পুথি প্রাচীনতম বলিয়া লব্ধ হইয়াছে তাহাই আমি আদর্শ ধরিয়া নির্ভর করিয়াছি এবং ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ অপর কয়েকটি পুথির সাহায্য লইয়াছি। প্রাচীনতম পুথিটির লিপিসমাপন-কাল ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দ। সহযোগী প্রধান প্রধান পুথির মধ্যে একটির শেষাংশ নাই, সুতরাং লিপিকাল অজ্ঞাত। আর একটিতে প্রথমার্ধ নাই শুধু শেষার্ধ, এটির লিপি-সমাপ্তিকাল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ। আর দুইটি সহযোগী ভালো পুথির মধ্যে একটির শেষ কয় পাতা পাওয়া যায় নাই, এবং অপরটির লিপিকাল ১২০০ সাল। সহযোগী প্রধান পুথিগুলির পাঠের সঙ্গে আদর্শ পুথির পাঠের মিল ও গরমিল দেখিয়া আদর্শ পুথির পাঠের উপর আমার আস্থা দৃঢ়তর হইয়াছে। তবে আদর্শ পুথিতেও যে কিছু পরিবর্জন ঘটিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। পরিবর্জিত বলিয়া অনুমিত অংশ মূল-পাঠে যোগ না করিয়া পাঠান্তরে দিয়াছি।

কবিকঙ্কণের কাব্য বহুবার ছাপা হইয়াছে। প্রথম ছাপা হইয়াছিল ১২৩০ সালে অর্থাৎ ১৮২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে ("কবিকঙ্কণ চক্রবর্তীর কৃত চণ্ডীর পুস্তক শ্রীযুক্ত রামজয় বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের দ্বারা শুদ্ধানুশুদ্ধ করিয়া কলিকাতায় শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইল শকাব্দা ১৭৪৫")। বইটিতে কতকগুলি ছবি ছিল, তাহা অর পুনর্মুদ্রিত হইল। এই সংস্করণটি পরবর্তী কালের সংস্কর্তা ও প্রকাশক, বিশেষ করিয়া বটতলার প্রকাশক, অনেকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। সংস্করণটি ভালো, কিন্তু আদর্শ কোন্ পুথির এবং পাঠ কোথায় কোথায় কিভাবে "শুদ্ধানুশুদ্ধ"

---

১ অর্থ শব্দার্থে দ্রষ্টব্য।

২ 'মুকুন্দরাম' এই বড় নামটি কবির রচনামধ্যে ভনিতায় একবারও পাই নাই। পাই—'মুকুন্দ', 'শ্রীমুকুন্দ', 'কবিকঙ্কণ', 'চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ', 'কবিচন্দ্রের ভাই', ইত্যাদি। পিতামহ জগন্নাথ, পিতা হৃদয়, পুত্র মুকুন্দ—সব একশব্দ নাম।

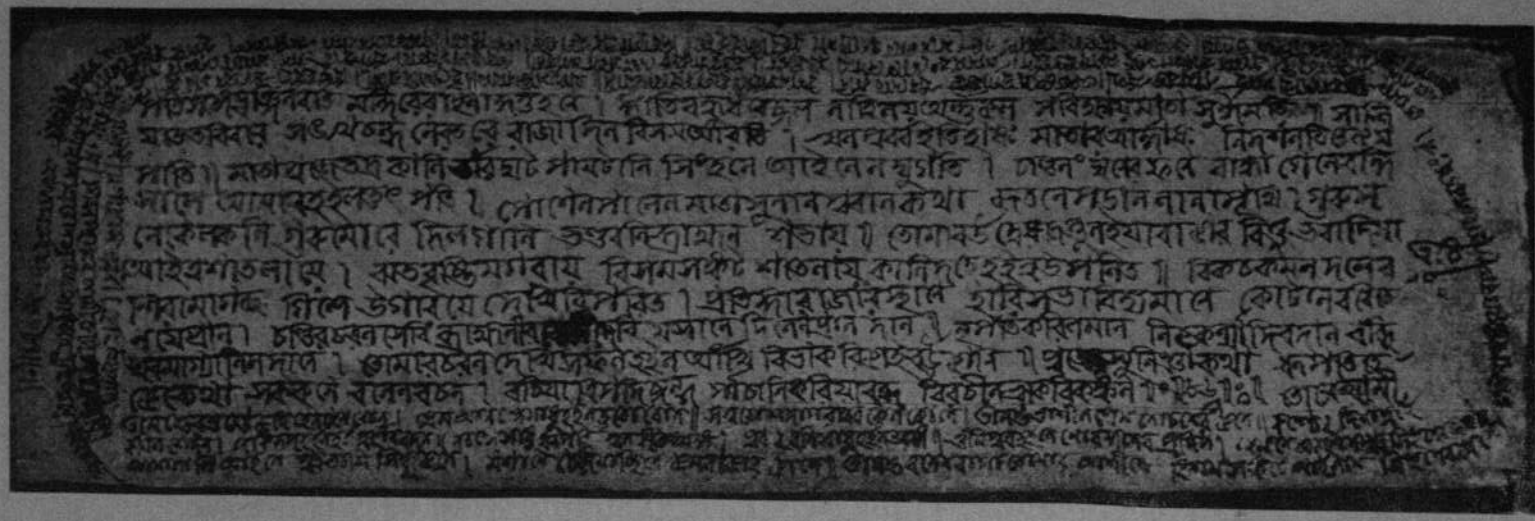

আদর্শ পুথির একটি পৃষ্ঠা

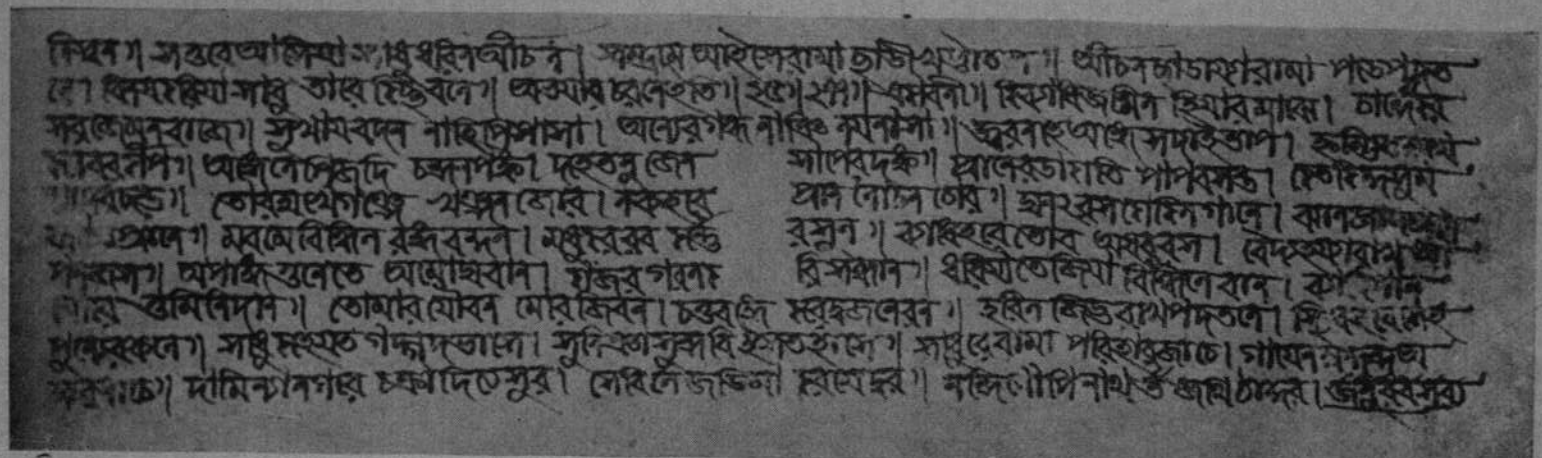

মাধবপুর পুথির একটি পৃষ্ঠা

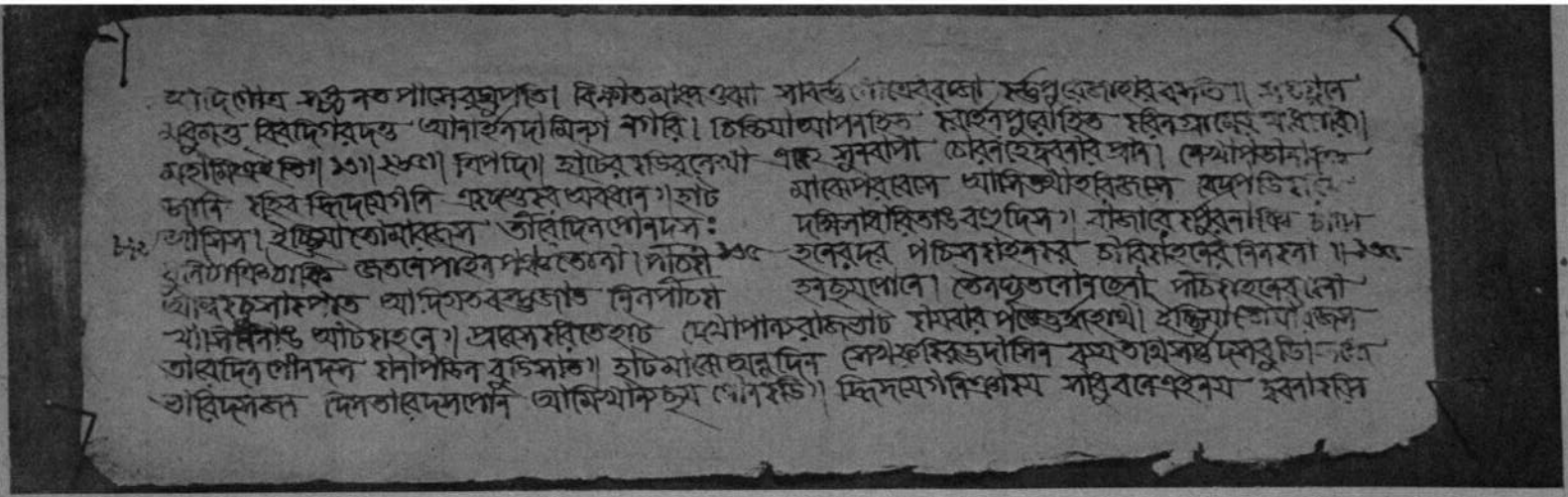

মাধবপুর পুথির আর একটি পৃষ্ঠা

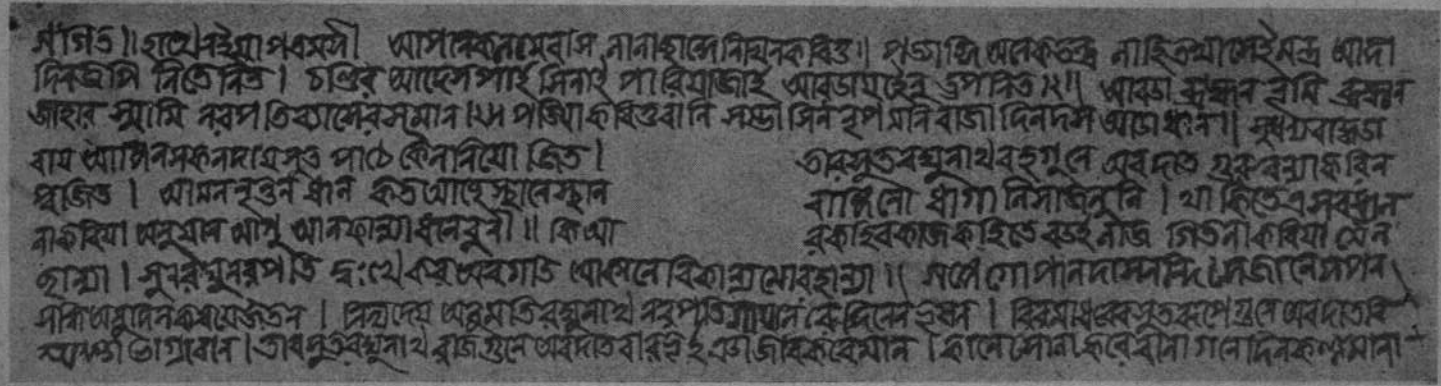

কালিকাপুর পুথির একটি পৃষ্ঠা

করা হইয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় না থাকায় তাহাতে অনির্বিচারে নির্ভর করা যায় না। (এই মন্তব্য পরবর্তী প্রায় সব সংস্করণগুলি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।) ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্করণের ভূমিকায় প্রকাশক লিখিয়াছিলেন যে তাঁহারা বসন্তরঞ্জন রায়ের নিকট হইতে ১২৩৫ সালের ছাপা সংস্করণ পাইয়াছিলেন। এই ছাপা সংস্করণ দেখি নাই এবং এ সংস্করণের সম্পর্কে আর কোন খবরও পাই নাই। রামজয়ের সংস্করণ প্রকাশের বিশ বছর পরে ১২৫০ সালে (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে) সিদ্ধেশ্বর ঘোষ চণ্ডীমঙ্গল প্রকাশ করিয়াছিলেন মদনমোহন তর্কবাগীশের সংশোধনে। ইহার কিছুকাল পরে (১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে) বাহির হইয়াছিল ঈশ্বরচন্দ্র তর্কচূড়ামণির সংশোধন। তাহার পর একটি ভালো সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল—নীলমণি চক্রবর্তীর দ্বারা সংশোধিত "কবিকঙ্কণ চণ্ডী সুকবিবর ৺মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কর্তৃক যাহা গৌড়ীয় সাধু ভাষায় বিরচিত" (১৮৬৮)। তাহার পর উল্লেখযোগ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সংস্করণ (চুঁচুড়া ১৮৭৮) এবং তাহার পরে বঙ্গবাসী কার্যালয় প্রকাশিত সংস্করণ (১৩০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৩)। বঙ্গবাসী সংস্করণে বিস্তৃতভাবে এবং অনেক পাঠান্তর দেওয়া আছে, কিন্তু পুথির পরিচয়, বিশেষ করিয়া লিপিকাল দেওয়া না থাকায়, বঙ্গবাসী সংস্করণটিকে সর্বত্র কাজে লাগানো যায় না।

কবির পরিচয় উদ্ধার এবং কাব্যের নষ্টোদ্ধার কাজে প্রথম ব্রতী হইয়াছিলেন দামিনের (—দামিন্যা-দামুন্যা নামের আধুনিক রূপ) অঞ্চলের, সাহিত্যপরিষদ্ এবং বটতলা উভয় মণ্ডলে একদা পরিচিত লেখক, অম্বিকাচরণ গুপ্ত (১৮৫২-১৯১৫)। ইনি দামিনে গ্রামে চক্রবর্তীদের গৃহে "মূল পুথি" বলিয়া সযত্নে রক্ষিত পুথিখানির পরিচয় প্রথম ছাপাইয়া দেন। বহু পাঠান্তর মিলাইয়া প্রথম আত্মপরিচয় পদের পাঠও উদ্ধার করিতে তিনি যত্নবান হইয়াছিলেন (প্রদীপ ১৩১২, 'কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডীকাব্য', পৃষ্ঠা ২৯১-৩০২)। অম্বিকাচরণের আগে শুধু রামগতি ন্যায়রত্ন মুকুন্দের মূল পুথির খোঁজ লইয়াছিলেন। ইনি রঘুনাথ-রায়ের রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল উদ্ধার করিয়া মুকুন্দ-গবেষণার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন—বলিতে পারি। অম্বিকাচরণের আবিষ্কৃত দামিনের পুথিটিকে কবির মূল পুথি মনে করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তাহা ছাপাইতে একদা খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে প্রযত্ন ব্যর্থ হয়। অনেক কাল পরে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হৃষীকেশ বসুর সাহায্যে দীনেশচন্দ্র সেন পুনরায় সে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে অসফল প্রযত্নের ফল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল দুই খণ্ডে (১৯২৪, ১৯২৬)। সেই সংস্করণে দীনেশচন্দ্রের ভূমিকায় পরিষদের ব্যর্থ-প্রযত্নের ইতিহাস বিবৃত আছে। (এই সংস্করণের সহকর্মরূপে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্তৃত 'চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী' রচিত ও প্রকাশিত হয়)।

অত্র পরিগৃহীত পাঠ চারপাঁচটি পুথির উপর নির্ভর করিয়াছে। তাহার মধ্যে একটিকে—যেটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন (তারিখ ধরিয়া) এবং শুধু একখানি পাতা বাদে সম্পূর্ণ—আদর্শ ধরিয়াছি। বাকি কয়টিকে কবিকঙ্কণের যে সব পুথি আমি নিরীক্ষণ করিয়াছি সেগুলির মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মনে করিয়াছি এবং পাঠসহায়করূপে গ্রহণ করিয়াছি। চণ্ডীমঙ্গলের কোন পুথির পাঠই সর্বদা এবং সর্বত্র প্রাচীন এবং খাঁটি নয়। অর্বাচীন পুথিতেও এমন পাঠ পাওয়া যায় যা পুরানো পুথির পাঠের তুলনায় খাঁটি। সেই কারণে অন্যান্য কয়েকখানি পুথির সাহায্যও আবশ্যক মতো গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই মন্তব্য কোন কোন ছাপা সংস্করণ সম্বন্ধেও অল্পস্বল্প খাটে। প্রধান পুথিগুলির এই আলোচনায় যথাক্রমে আদর্শ (সংক্ষেপে আ°), মাধবপুর (সংক্ষেপে মা°), গোহাটি (সংক্ষেপে গো°), সোনামুখী (সংক্ষেপে সো°) এবং আরাণ্ডি-মাধবপুরের পুথি (সংক্ষেপে আরাণ্ডি) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম পুথিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি (পুথিসংখ্যা ১০৮৬), দ্বিতীয় পুথিখানি বর্ধমান সাহিত্য সভার সম্পত্তি (শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সংগৃহীত), তৃতীয় পুথিখানি হুগলীর অধ্যাপক বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়ার সৌজন্যে প্রাপ্ত, চতুর্থ পুথিটি শ্রীসুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পাওয়া, আর পঞ্চম পুথিখানি বর্ধমান সাহিত্যসভার সম্পত্তি। আর একটি পুথিও কাজে লাগিয়াছে, তাহাও সাহিত্য সভার (শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়ালের সংগ্রহ)।

আদর্শ পুথিটি ভুরশুট অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। লিপিসমাপ্তি কাল ১৬৩৮ শকাব্দ ১১২৪ সাল ১৭ আষাঢ় (১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দ)। লিপিস্থান 'মোকাম রাধানগর পাড়ুয়া পরগনে ভুরশীট তালুক শ্রীজুত কিত্তিচন্দ্র রায়ের"।

পুথি যেখানে লেখা হইয়াছিল তা রামমোহন রায়ের পিতৃভূমি, এবং পুষ্পিকায় উল্লিখিত কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ ছিলেন বলিয়াই আমার ধারণা। পুথিটিতে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা আমি অন্য কোন পুরানো পুথিতে দেখি নাই। কোন কোন পৃষ্ঠার মার্জিনে অন্য পুথি হইতে রূপান্তর, পাঠান্তর—এমন কি গোটাগোটা পদ—উদ্ধৃত দেখা যায়। পুথিটিকে তাই একরকম সংকলিত (collated) পুথি বলিতে পারি। পুথিতে ভাষায় এবং বানানে আগাগোড়া সামঞ্জস্য—যথাসম্ভব—আছে। এ ব্যাপারও দুর্লভ। একটি উদাহরণ দিই। মিল-ধাতু সর্বদা মিলনার্থক, আর মেল-ধাতু সর্বদা ত্যাগার্থক।

লিপিতে এবং বানানে পুথিটি বিশেষত্ববর্জিত নয়। কখনো কখনো অ-কারের তলায় উ-কারের কলা দিয়া উ-কার লেখা হইয়াছে। বিসর্গযোগে প্রায়ই ব্যঞ্জনধ্বনির যুগ্মতা অভিব্যক্ত। ঋ-কার ও র-ফলার মধ্যে ভেদ প্রায়ই নাই। পদান্ত এ-কার সর্বদাই 'য়'। যেমন 'হৃদয়' = 'হৃদএ' (হৃদয়ে)। পদমধ্যে অনেক সময় প্রত্যাশিত চন্দ্রবিন্দু দেখা যায় না। কিন্তু 'মহা' সর্বদাই 'মহাঁ'। অন্যান্য অনেক পুথিতে যেমন, ন-কারে ণ-কারে ও ল-কারে, জ-কারে ও য-কারে, এবং তিন শ-কারে ভেদ নাই। ব-ফলা দিয়া ব্যঞ্জনের যুগ্মতা অথবা উ-কার প্রকাশিত। যেমন, 'ফুল্বরা চম্বক সাথে' = 'ফুল্লরা চলুক সাথে'। সমসাময়িক উচ্চারণ অনুসারে 'ধ' প্রায়ই 'দ' এবং অন্ত্য আ-কার কোন কোন স্থানে 'আ্য'। যেমন 'অবদি' = 'অবধি'; 'রক্ষ্যা' = 'রক্ষা'; 'সুশিল্যা' = 'সুশীলা'। দৈবাৎ অপিনিহিতি দেখা যায়। যেমন 'বাইন্যানি' = 'বান্যানি'; 'ঘোষ-বোউষের' = 'ঘোষ-বসুর'; 'কুড়াইর' = 'কুড়ারি'; 'বাইষ' = 'বাসি'। পদাদিতে 'প্র' সর্বদাই প্রে'। মাঝে মাঝে ও-কার স্থানে উ-কার এবং উ-কার স্থানে ও-কার পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে লেখক হয় পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন, নয় তিনি শ্রুতিলিখন করিয়াছিলেন এবং যিনি পড়িয়া যাইতেন হয়ত তিনি পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন। যেমন, 'কুটি' = 'কোটি'; 'স্রোতি' = 'শ্রুতি'; 'সুনিত' = 'শোণিত'। শব্দে প্রত্যাশিত চন্দ্রবিন্দুর বর্জনেও এই অনুমান সমর্থিত হয়।

গো° পুথির শেষ কয়টি পাতা না থাকায় লিপিকাল জানা গেল না। তবে কাগজ ও লিপিছাঁদ দেখিয়া মনে হয় যে লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কাছাকাছি। কাগজ লালচে রঙের তামাক-পাতার মতো, আকারে দীর্ঘ। উত্তরপূর্ব-বঙ্গে প্রচলিত ধরণের লিপিতে লেখা, তবে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। অ-কার আ-কার ও ই-কার মৈথিলি অক্ষরের মতো। ব-কারের তলায় ফুটকি আছে। র-কার ঈষৎ পেটকাটা, অনেক সময় বোঝাই যায় না। পদান্তে সর্বদা ঈ-কার ব্যবহৃত। লিপিকর প্রায় সর্বদা ক্রিয়াপদে আঞ্চলিক (অর্থাৎ উত্তরপূর্ববঙ্গীয়) রূপ চড়াইয়াছেন, এবং মাঝে মাঝে অপরিচিত (পশ্চিমবঙ্গীয়) শব্দের বদলে পরিচিত (উত্তরপূর্ববঙ্গীয়) প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন, 'দেখিলাণ্ড' স্থানে 'দেখিলেন', 'করিঞা' স্থানে 'কৈরে', 'বাঘহাতা' স্থানে 'হাতাকড়ি' (=হাতকড়ি), 'সিউলি' স্থানে 'গুড়াতি' (= খেজুর গুড় প্রস্তুতকারী)। পুথিটি নোয়াখালি-চাটিগাঁ অঞ্চলের হওয়া অসম্ভব নয়।

মা° পুথি আরামবাগ অঞ্চলের। অস্তাখণ্ডিত, খুল্লনার পরীক্ষার আগে পর্যন্ত আছে। লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পরে নয় বলিয়া মনে হয়। আদর্শ পুথির সঙ্গে বেশ মিল আছে। তবে শব্দের ব্যবহারে দুইটি পুথির মধ্যে কিছু কিছু তফাৎ দেখা যায়। যেমন, 'বাগ্‌তি' (মা°) : 'বাগদি' (আ°); 'ছাতানাটা' (মা°) : 'টোকাছাতা' (আ°); 'মালঝাঁপ' (মা°) : 'মালঝাঁপা' (আ°); ইত্যাদি।

সো° পুথির লিপিকাল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ। পুষ্পিকা—"লিখিতং শ্রীশ্রীনাথ মৈত্র মজুমদার এ পুস্তক শ্রীশ্রীনিবাস আড়ি পোতদারের সাঃ সোনামুখির আড়াপাড়ার। সন ১২২৩ সাল তারিখ ২৫ কার্তিক সনিবারি চারিদণ্ড বেলা থাকিতে সংপুন্ন হৈল ইতি॥" পুথিটি সম্পূর্ণ, পাতা ১-১৭৪। ইহাতে শুধু খুল্লনার উপাখ্যান আছে। আরম্ভ—"অথ বণিক খণ্ড লিক্ষতে॥ দীর্ঘ ছন্দ॥ অর্দ্ধচন্দ্র রাগ॥ ধরি মনোহর নিলা নাচে রামা রত্নমালা" ইত্যাদি। যে পুথি হইতে লেখা তাহা সম্পূর্ণ ছিল, কেন না মধ্যে মধ্যে গোড়া হইতে টানা পদসংখ্যা দেওয়া আছে। সপ্তম পদের শেষে সংখ্যা আছে ২০৬। সুতরাং ধরিতে পারি যে আক্ষটি-খণ্ডে কবিতা-সংখ্যা ছিল ১৯৯। পুথিটির পাঠ খুব ভালো। সম্পূর্ণ মিলিলে এইটিই আদর্শ করা যাইত। পুথিটি কোন গায়কের পুথি হইতে গানের উদ্দেশ্যে লেখা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গান করিবার ধারার যে সব নির্দেশ আছে তাহার অনেকগুলি অন্য কোথাও দেখি নাই। যেমন 'চালান' অর্থাৎ একটানা সুরে তালে আউড়িয়া যাওয়া; 'ধাবাড়ি' অর্থাৎ দ্রুতবেগে গাহিয়া যাওয়া। 'ছুটা মান', 'ঝাঁপা মান', 'ছুটা জতি' (পাঠ "জাত")—এগুলি তালের নির্দেশ। অনেকগুলি প্রাচীন এবং ভালো ধুয়া পদ আছে।

পঞ্চম পুথিখানি মা-পুথির অঞ্চলের। লিপিসমাপ্তি-কাল ২২ আশ্বিন ১২০০ সাল। "লিখিতং শ্রীগদাধর সরকার নিবাস পরগনে বায়ড়া মৌজে আরাণ্ডি॥...পাঠক শ্রীজুক্ত বিপ্রচরণ রায় নিবাস পরগনে বায়ড়া মৌজে মাধবপুর"।

ষষ্ঠ পুথিখানি (পৈয়ালি পুথি) বজবজ অঞ্চলের। লিপিসমাপ্তিকাল ১২৪৮ সাল।

কবিকঙ্কণের কাব্যের পুথি অনেক পাওয়া গিয়াছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের, বর্ধমান সাহিত্যসভার, বিশ্বভারতীর এবং রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের। পদসংখ্যা ধরিয়া সম্পূর্ণ পথিগুলিকে দুই শ্রেণীতে ফেলা যায়—হ্রস্ব ও দীর্ঘ। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে হ্রস্ব শ্রেণীর পুথিগুলিতে প্রক্ষেপের ভাগ কম, দীর্ঘ শ্রেণীতে প্রক্ষেপের ভাগ বেশি। গো° পুথি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের-৬১৪১ সংখ্যক পুথি এবং বর্ধমান সাহিত্যসভার পৈয়ালি পুথি দীর্ঘ শ্রেণীর পুথিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের দিক দিয়া দেখিলেও কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর পুথিগুলি দুইটি থাকে পড়ে। একটি কিছু সংক্ষিপ্ত, অপরটি কিছু বিস্তৃত। এই বিস্তার-সংক্ষেপ ধরিয়া প্রাচীনত্বের বিচার আপাতত নির্ভরযোগ্য নয়, তবে কিছু কিছু বিস্তার যে পরবর্তী কালের তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। অর্বাচীন বিস্তর দেব-খণ্ডে এবং বণিক-খণ্ডেই বেশি ঘটিয়াছে। কালকেতু-উপাখ্যানের তুলনায় ধনপতি-উপাখ্যান বেশি জনপ্রিয় ছিল, অর্থাৎ ধনপতি-শ্রীপতির কাহিনীটাই প্রধানত গীত হইত। তাই এই উপাখ্যানটির পুথি বেশি পাওয়া যায়। শুধু কালকেতু-উপাখ্যানের পুথি দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না॥

২

কাব্য নাম ও রীতি

মুকুন্দের কাব্যে পদাবলীর ভনিতায় কোন সুনির্দিষ্ট একটি নাম ব্যবহৃত নয়। 'অভয়ামঙ্গল', 'অম্বিকা-মঙ্গল', 'চণ্ডিকামঙ্গল', অথবা 'হৈমবতীশঙ্কর-মঙ্গল', 'নূতন মঙ্গল', 'চণ্ডিকার ব্রতকথা' ইত্যাদি পাই ভনিতায়। কাব্যটিতে যে-তিনটি কাহিনী বর্ণিত আছে তাহাতে দেবী অভয়ার পূর্ব ইতিহাস এবং মর্ত্যভূমিতে তাঁহার পূজা

প্রচারের কথা পাই। দেবী চণ্ডী এখানে মঙ্গলময়ী, তিনি অভয়দাত্রী মঙ্গলচণ্ডী। তাই এমন দেবীমাহাত্ম্য কাব্য 'চণ্ডীমঙ্গল' নামেই সর্বাধিক পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, রচনা মাত্রই গেয় বস্তু ছিল। অর্থাৎ তাহা সুরসংযোগে উচ্চারিত অথবা পঠিত হইত। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে কোন কোন বৈষ্ণবীয় রচনায় এই রীতির অল্পস্বল্প ব্যতিক্রম দেখা গেলেও এ লক্ষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত খাটে। সুতরাং পুরানো বাংলা সাহিত্য গীতিনির্ভর বলিলে অন্যায় হয় না।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় (অর্থাৎ বৈদিকে ও সংস্কৃতে) পদ্যের একক (ইউনিট) ছিল শ্লোক। শ্লোকের ইউনিট চরণ। দুই অথবা চার চরণে শ্লোক। প্রত্যেক চরণে অক্ষরসংখ্যা সমান, এবং চরণে অক্ষরের হ্রস্ব-দীর্ঘতার ক্রম সুনির্দিষ্ট। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রথম অবস্থায় (অর্থাৎ পালিতে) দেখা গেল পূর্বেরই শ্লোকবদ্ধ-রীতি প্রায় অবিচলিত। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে (অর্থাৎ প্রাকৃতে) পাওয়া গেল শ্লোকবন্ধের এক নূতন রীতি, যাহাতে শ্লোকের দুই অংশের মধ্যে ভারসাম্য—অর্থাৎ অক্ষরের বা মাত্রার সমতা—নাই। ইতিমধ্যে ভাষায় ধীরে ধীরে অক্ষরের লঘুগুরুত্বের মান বদলাইয়া আসিয়াছে এবং তাহার ফলে পদ্যের ইউনিট চরণে স্বরধ্বনির অথবা অক্ষরের সংখ্যা ও সে স্বরধ্বনির লঘুগুরুত্বের ক্রমবিন্যাসের উপর নির্ভরশীল হইয়াছে। শ্লোকের চরণে মাত্রাবৈষম্য আসিয়াছিল গান হইতে। অনুমান করি, বৈদিকে কোন কোন ধরণের গানে এ রীতি ছিল। এবং সে রীতি গানের মধ্য দিয়াই কথ্য ভাষায় সঞ্চারিত ছিল। সে কথ্যভাষা ছিল প্রাকৃত। সংস্কৃতে এ রীতি হয়ত সমসাময়িক কথ্য ভাষা অর্থাৎ প্রাচীন প্রাকৃত হইতেই আসিয়াছিল। বৈদিকে গান অর্থে 'গাথা' শব্দটি প্রচলিত ছিল। প্রাকৃতে এই গানের ছন্দের নাম হইয়াছিল 'গাহা' (গাথা)। অর্বাচীন সংস্কৃতে এই ছন্দের নাম (এবং প্রাকৃতে নামান্তর) হয় 'আর্যা' (অর্থাৎ প্রাচীন গাথারীতি—আর্যা গাথা)।

ছন্দরীতিকে বদলাইয়া দিলেও গান প্রাকৃত সাহিত্যে কবিতার বাহ্য রূপে বেশি পরিবর্তন আনিতে পারে নাই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে রূপান্তর-কর্ম চলিতেছিল। তাই আর্য ভাষার তৃতীয় স্তরে (অর্থাৎ লৌকিকে-অপভ্রংশে) পৌঁছিয়া দেখিতে পাই যে কবিতা প্রায় সম্পূর্ণ গীতিনির্ভর হইয়াছে এবং ছন্দের চরণে অক্ষরসমতা আসিয়াছে এবং উপরন্তু জোড়া জোড়া চরণের শেষ অক্ষরে মিল ঘটিতেছে। এই অন্ত্যানুপ্রাস সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে অজ্ঞাত। কবিতা ও গানের অবিচ্ছেদ্য সংযোগও এই ভাবে লৌকিক স্তর হইতে শুরু। ষোড়শ শতাব্দীর আগে কবিতা ও গানের এই গাঁটছড়া শিথিল হয় নাই। তবে একেবারে খুলিয়া গিয়াছে উনবিংশ শতাব্দীতে।

ছবি ও গানের, গল্প ও কবিতার, সমযোগ সংস্কৃত সাহিত্যে অজ্ঞাত নয়। তবে সংস্কৃত ভাষার এমনি দুর্বার শক্তি যে সে ভাষার সাহিত্যে বাচনই সর্বদা প্রধান, বাচ্য নয়। অর্থাৎ কী বলা হইতেছে তাহার অপেক্ষা কেমন করিয়া বলা হইতেছে সেই দিকেই কবির মন নিমগ্ন। সেকারণে সংস্কৃত সাহিত্যে, এমন কি উপদেশকথা পুরাণেও, কথন সর্বদা কথ্যকে খর্ব করিয়া রাখে। যেখানে কথা বলিতে বড়সড় কিছু নাই কথনই সর্বস্ব, সেখানে সংস্কৃত সাহিত্য কবিতারচনায় সার্থক, কিন্তু কথাসর্বস্ব গল্পরচনায় তা ব্যর্থ। সংস্কৃত সাহিত্যে এই দিক দিয়া 'মেঘদূত' ও 'কাদম্বরী' সার্থকতার ও ব্যর্থতার ভালো উদাহরণ। (বলা বাহুল্য কাদম্বরীকে আমি গল্পের বই বলিয়াই এখানে ধরিতেছি, কাব্য বলিয়া নয়।) কবিত্ব-বাদাই বর্জিত গল্পকথার বই পরবর্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা প্রাকৃত-অপভ্রংশ রচনার হয় অনুবাদ নতুবা অনুসরণ। যেমন কথাসরিৎসাগর ও বেতালপঞ্চবিংশতি। প্রবীণ সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যে এ রচনাগুলি গণ্য নয়।

বাংলার মতো কোন কোন নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষায় প্রথম হইতেই কবিতা সুরের বাহনে আবির্ভূত

হইয়াছিল। গানই হোক অথবা আখ্যায়িকা হোক শিল্পিত রচনামাত্রেই হয় গাওয়া হইত (ত্রিপদী, নাচাড়ি) নয় সুরে তালে আওড়ানো হইত (পয়ার)। এই ধারা চলিয়া আসিয়াছিল সেদিন পর্যন্ত।

বিশিষ্ট দেবপূজায় দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনী আবৃত্ত অথবা গীত হইবার রীতি এ দেশে বহুকালের। অন্যত্র যেমন এদেশেও তেমনি বৌদ্ধ বিহারে স্তূপমূলে অথবা বোধিসত্ত্ব-প্রতিমার সম্মুখে সন্ধ্যাবন্দনায় স্তোত্র এবং উদাত্ত আখ্যায়িকা উদ্‌গীত হইত। চীনীয় পরিব্রাজকদের ভ্রমণকাহিনীতে তাহার উল্লেখ আছে। উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরে দেবদাসীদের দ্বারা শিবের ত্রিপুর-বিজয় কাহিনী গীত হইবার কথা কালিদাস মেঘদূতে উল্লেখ করিয়াছেন। এই দেবগীতির ধারা যে এদেশেও জনসমাজে চলিয়া আসিয়াছিল যে কথা মানিতে হয়। সেই ধারারই বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বিশিষ্ট উদাহরণ পাই কবিকঙ্কণের কাব্যে। কাব্যের ভনিতায় একাধিকবার উল্লেখ আছে যে রচনাটি "ব্রতগীত", "মঙ্গল", "পাঞ্চালিকা" (বা "পাঁচালি")। 'ব্রতগীত' বোঝায় যে কোন বিশিষ্ট দেবারাধনার গেয় রচনা। 'মঙ্গল' বোঝায় যে রচনাটি আনুষ্ঠানিক ভাবে গান করিলে যজমানের (ও শ্রোতাদের) মঙ্গল হয়। 'পাঞ্চালিকা' বোঝায় যে রচনাটি গান করিবার সময় কাহিনীর পাত্রপাত্রীর পুত্তলিকা অথবা চিত্র প্রদর্শিত হইত। "মঙ্গল" আখ্যায়িকা-গানে পুত্তলিকা অথবা চিত্র প্রদর্শন রীতি অনেক কাল আগেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তবে 'পাঞ্চালিকা' নামটি রচনার সৌষ্ঠব ও আকর্ষণ-জ্ঞাপক বলিয়া টিকিয়া যায়, শুধু বাংলা দেশে নয় অন্যত্রও। গোড়ার দিকে মুকুন্দের কাব্যও যে চিত্র-প্রদর্শন অথবা পুত্তলি-নর্তন সহকারে গীত হইত তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ সো° পুথির একটি ভনিতায় (৭৭ ক) পাইয়াছি,—"রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ চিত্রের পাঁচালি মনোহরা॥"

মধ্য ভারতীয় আর্য সাহিত্যে লৌকিক স্তরে বিশুদ্ধ রোমান্টিক গল্প কিছু কিছু লেখা হইতে থাকে। জৈন কবিরা এই রকম কয়েকটি কাহিনী ধর্মকথা ও নীতিকথা রূপে তাঁহাদের (ধর্ম-) সাহিত্যের মধ্যে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। একটি ভালো উদাহরণ ধনপালের রচিত 'ভবিস্‌সয়ত্তকহা'। এই ধরণের রচনাই কবিকঙ্কণের কাব্যের মতো আখ্যায়িকা-পাঞ্চালিকার বোধ করি প্রাচীনতম সূত্র। এই ধরণের বৃহৎ আখ্যায়িকার মধ্যে কবির বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় থলি উজাড় করিয়া দিতে পারা যাইত। রাজসভাবর্ণনা নগরবর্ণনা অরণ্যবর্ণনা জীবজন্তু গাছপালা ইত্যাদির তালিকা ও দেশ-বিদেশের হাট-বাজারের পরিচয় নদী নালা সমুদ্র পর্বত পর্যন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের যত কিছু সামগ্রী তখনকার দিনের কবির পক্ষে জানা সম্ভব ছিল সব কিছুর ফিরিস্তি যথাসাধ্য দেওয়া হইত। তুলনীয়, প্রাচীন রাজস্থানীতে লেখা গণপতির 'মাধবানল-কামকন্দলা'। এই রকম বুদ্ধিবিদ্যাজ্ঞানের সংক্ষিপ্তসার কড়চার মতো বই একদা কবি ও কথকদের ব্যবহারের জন্য লেখা হইয়াছিল। যেমন মৈথিলী ভাষায় লেখা জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণনরত্নাকর' (আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ)। সংস্কৃতে ও গুজরাটীতে লেখা এই রকম কয়েকটি পুস্তিকা (ষোড়শ শতাব্দী) 'বর্ণকসমুচ্চয়' নামে প্রকাশিত হইয়াছে (বড়োদা ১৯৫৬, সম্পাদক ভোগীলাল জ. সাণ্ডেসরা)। প্রাচীন কবি-কথকের মালমসলার এই রকম কোন এক ঝুলি যে মুকুন্দের ব্যবহারেও লাগিয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে চণ্ডীমঙ্গলে। বিশেষ করিয়া কালকেতু-উপাখ্যানে—কাঁচুলি নির্মাণ, বন-কর্তন, নগর-পত্তন ইত্যাদিতে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত॥

৩

কথা-বস্তু

কবিকঙ্কণের কাব্যে চারটি ভাগ—বন্দনা, সতী-পার্বতীর উপখ্যান (বা দেব-খণ্ড), কালকেতু-ফুল্লরার উপাখ্যান (বা আখেটি-খণ্ড) ও ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীপতির উপাখ্যান (বা বণিক-খণ্ড)। বন্দনা অংশের সহিত কাব্যকাহিনীর

কোন যোগ নাই, আনুষ্ঠানিকভাবে গীত হইবার বেলায় দেবতা-বন্দনা প্রথমেই আবশ্যক, তাই এই অংশ "স্থাপনা পালা"। দেব-খণ্ড আরম্ভ হইয়াছে সৃষ্টিবর্ণনা করিয়া। (এই রীতি পুরাণ হইতে চলিয়া আসিয়াছে।) ত্রিভুবন ও দেবাসুর-নর সৃষ্টির পর দক্ষের কন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ, শ্বশুর-জামাতার মনান্তর, বিনা নিমন্ত্রণে দক্ষের যজ্ঞোৎসবে সতীর আগমন ও আত্মোৎসর্গ, শিব-অনুচরের হাতে দক্ষের নিগ্রহ, তপস্যা করিতে হিমালয়ে শিবের গমন এবং তাহার পর, প্রধানত কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুসরণে, শিবের তপস্যা-ভঙ্গ, পার্বতীর তপস্যা এবং শিবের সহিত পার্বতীর বিবাহ, তাহার পর শিবের ঘরজামাই রূপে শ্বশুরালয়ে বাস, গণেশের ও কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি, মাতার সহিত পার্বতীর মনান্তর, সপরিবারে শিবের কৈলাসে প্রস্থান, সেখানে দারিদ্র্যের সংসারে পার্বতীর ক্লেশ। তখন মর্ত্যলোকে পূজা পাইয়া যুগপৎ যশঃপ্রাপ্তি ও দারিদ্র্য-ক্লেশ নিবারণের প্রচেষ্টায় পার্বতীকে সখীর পরামর্শ দান। এইখানে প্রথম উপাখ্যান শেষ।

পর্বত-রাজপুত্রী দেবী আসলে অরণ্যানী। তিনি অরণ্যভূমিপূর্ণ কলিঙ্গ জনপদের অধিপতিকে স্বপ্ন দিলেন। সেই অনুসারে রাজা কংসনদের তীরে অরণ্যভূমির প্রান্তে দেবীর বিচিত্র দেউল নির্মাণ করাইয়া তাহাতে একক দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভালোরকম পূজার ব্যবস্থাও হইল। দেবী সশরীরে আসিয়া পূজা লইলেন। পূজা পাইয়া খুশি হইয়া দেবী স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছেন এমন সময়ে আরণ্য প্রাণীরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নিজেদের দেবতা জানিয়া সাধ্যমত পূজা দিল। দেবী অভয়া তাহাদের সকলকে ভরসা দিলেন এবং সিংহকে রাজা করিয়া অন্য পশুদের তাহার অধীনে যথাযোগ্য নিয়োগ ব্যবস্থা করিয়া কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

পূজা পাওয়া গেল, কিন্তু আরণ্য রাজার ও পশুর সে পূজায় দেবীর খুব সন্তোষ হইল না,—জনবিরল সমাজে দেবমাহাত্ম্য যেন গুপ্ত হইয়া রহিল। সখী পদ্মাবতী তখন আবার পরামর্শ দিলেন। শিবভক্ত ইন্দ্রের পুত্র অরণ্যরসিক নীলাম্বরকে দেবী শিবের শাপ দেওয়াইয়া মনুষ্যজন্ম লইতে বাধ্য করিলেন। সে তাঁহার মাহাত্ম্যপ্রচারের হেতু হইবে। কলিঙ্গ জনপদে ব্যাধের ঘরে নীলাম্বর জন্ম লইল, নাম হইল কালকেতু। যথাসময়ে তাহার বিবাহ হইল, পত্নীর নাম ফুল্লরা। স্বামী-স্ত্রীর সংসার। কালকেতু বনে বনে ঘুরিয়া পশু শিকার করে, ফুল্লরা হাটে পসার দিয়া অথবা লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া মাংস বেচে। দরিদ্রের সংসার তবে স্বচ্ছল চলে। কিন্তু দিন দিন কালকেতুর পশু-জিঘাংসা বাড়িতে লাগিল, তাহার ফলে বনের পশু অযথা বিনষ্ট হইতে থাকে। পশুরা একজোট হইয়াও তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিল না। অবশেষে পশুরা দেবীর শরণ লইল। দেবী তাহাদের পুনরায় অভয় দিয়া কালকেতুর শিকার-দৃষ্টি হরণ করিয়া লইলেন। তাহার চোখে আর কোন শিকারই পড়ে না। ব্যাধ-দম্পতী মুশকিলে পড়িল। একদিন কালকেতু একটি সোনারঙের গোসাপ ছাড়া বনে আর কোন পশুই দেখিতে পাইল না। সেই গোধাকেই ধরিয়া আনিল। বাড়িতে আসিয়া দেখিল ফুল্লরা ঘরে নাই। সে গোসাপটিকে চালার খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখিয়া পত্নীকে খুঁজিতে গেল। দেবী তখন গোধিকা-রূপ ত্যাগ করিয়া মোহিনী ষোড়শী মূর্তি ধারণ করিলেন। অন্য দিক হইতে ফুল্লরা ঘরে ফিরিয়া দেখিয়া অবাক। স্বামী আসিয়া পড়িবার আগেই যাহাতে মেয়েটি চলিয়া যায় সেজন্য সে অশেষ নির্বন্ধ করিল। দেবী কিন্তু অনড়। তখন ফুল্লরা অভিমান করিয়া স্বামীর সন্ধানে ছুটিল। একটু পরে স্বামীকে লইয়া আসিল। কালকেতুও মেয়েটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং তাহাকে চলিয়া যাইতে বিনীতভাবে অনুরোধ করিল। দেবী যখন কিছুতেই উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন না তখন কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে ধনুকে তীর জুড়িল। কিন্তু তীর ছোঁড়া গেল না, দেবীর মায়ায় কালকেতুর হস্ত-স্তম্ভ হইল। অতঃপর দেবী হতবুদ্ধি দম্পতীকে আত্মপরিচয় দিয়া কালকেতুকে একটি সোনায় আংটি এবং বনের মধ্যে সাত ঘড়া ধনের সন্ধান দিলেন, সে যেন পশুহিংসা ত্যাগ করিয়া অহিংস সম্ভ্রান্ত জীবন স্বচ্ছন্দে যাপন করে। সেই ধন

পাইয়া কালকেতু বন কাটাইয়া নিজ রাজ্য গুজরাটে নগর স্থাপন করিল। দেবীর সহায়তায় কালকেতু গুজরাটে ভালো প্রজা বসতি করাইয়া নগর জাঁকাইয়া তুলিল। নবাগত প্রজাদের মধ্যে একজন ছিল জুয়াচোর ঠক, নাম ভাঁড়ু দত্ত। তাহার অত্যাচারে হাটের বাটের লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া কালকেতুর কাছে নালিস করিলে পর কালকেতু ভাঁড়ুকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। ভাঁড়ু কলিঙ্গ রাজার কাছে গিয়া কালকেতুর বিরুদ্ধে উস্কানি দিল। রাজা সৈন্য পাঠাইয়া কালকেতুকে ধরিয়া আনিতে কোটালকে হুকুম দিলেন। কালকেতুর সঙ্গে যুদ্ধে কোটাল হারিয়া গেল। ভাঁড়ু তাহাকে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিতে যুক্তি দিল। এবারে পত্নীর পরামর্শে কালকেতু যুদ্ধ না করিয়া আত্মগোপন করিল এবং শেষে ধরা পড়িল। রাজা তাহাকে নিপীড়ন করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। নিশীথে দেবী রাজাকে ভয় দেখাইয়া স্বপ্ন দিলেন। প্রভাতে রাজা কালকেতুকে মুক্তি দিয়া এবং প্রচুর সম্মান করিয়া গুজরাটে পাঠাইয়া দিলেন। তখন ভাঁড়ু দত্ত আবার কালকেতুর দরবারে ভালো মানুষ সাজিয়া আসিল। কালকেতু তাহাকে ভর্ৎসনা ও অপমান করিয়া সভা হইতে দূর করিয়া দিল কিন্তু দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল না। তাহার পর যথাকালে কালকেতুর শাপান্ত হইল। ইন্দ্র ও শাচী তাঁহাদের পুত্রকে স্বর্গলোকে ফিরিয়া পাইলেন। এই হইল দ্বিতীয় উপাখ্যান।

দেবীর পূজা প্রচার হইল বটে কিন্তু তা প্রত্যন্ত ও সঙ্কীর্ণ অঞ্চলে, কলিঙ্গ জনপদে, এবং দরিদ্রের সমাজে। এমন পূজায় দেবী সম্পূর্ণ খুশি হইতে পারিলেন না। তখন পদ্মা পরামর্শ দিল দেশের উন্নত শহর উজানিতে ধনী বণিক এবং পরম শিবভক্ত ধনপতিকে অবলম্বন করিয়া নূতন পূজা-খেলা দেখাইতে। ধনপতির কাছে পূজা আদায় করিতে পারিলে নামযশ তো খুবই হইবে, উপরন্তু শিবকেও কিছু শিক্ষা দেওয়া যাইবে। সখীর পরামর্শ পার্বতী গ্রহণ করিলেন। আগেবার তাঁহার শুধু এক ব্রতদাস ছিল-ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর, এবারে তাঁহার ব্রতদাসী ও ব্রতদাস দুইই হইল। ব্রতদাসী হইল ইন্দ্রসভার নর্তকী রত্নমালা, ব্রতদাস হইল দেবনট মালাধর—কাহিনীতে যথাক্রমে ধনপতির দ্বিতীয় পত্নী ও তাহার গর্ভজাত পুত্র। ধনপতি বিবাহিত পুরুষ, পত্নী লহনা উজানির অনতিদূরবর্তী ইছানি নগরের অধিবাসী বণিকের কন্যা। একদিন পায়রা উড়াইতে উড়াইতে ধনপতি ইছানিতে গিয়া পড়িল এবং পত্নী লহনার খুল্লতাত ভগিনী খুল্লনাকে দেখিল। দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার প্রবৃত্তি জাগিল। ধনপতি পুরোহিত ও পরামর্শদাতা জনার্দন ওঝার সহিত চক্রান্ত করিয়া তাড়া-হুড়ার মধ্যে খুল্লনাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। বিবাহের পরদিনই সে রাজাদেশে গৌড় যাইতে বাধ্য হইল। সেখানে সোনার খাঁচা গড়াইবার জন্য তাহাকে এক-বছর থাকিতে হইল। লহনা প্রথমে সপত্নীকে ভালোভাবেই লইয়াছিল। তাহাদের সংসারের দাসী এবং অভিভাবক দুবলার (=দু-বোলা?) বাঁকা কথায় লহনার ধারণা হইল যে খুল্লনা হইতে তাহার স্বামী-সৌভাগ্য নষ্ট হইবে, সুতরাং সে তাহার শত্রু। খুল্লনা অলক্ষণা এই অপবাদ দিয়া ধনপতির লেখা জালচিঠি দেখাইয়া, দুর্গ্রহ কাটাইবার ছল করিয়া, খুল্লনার নীচ বেশ নীচ আহার নীচ শয্যা ইত্যাদি বিধান করিয়া তাহাকে প্রত্যহ নগরের বাহিরে গিয়া ছাগল চরাইতে বাধ্য করা হইল। এইভাবে প্রায় বৎসর কাল কাটিলে দেবী প্রসন্ন হইয়া বিদ্যাধরীদের দিয়া খুল্লনাকে আপনার পূজাব্রত শিখাইয়া দিলেন। তাহার পর দেবী ধনপতিকে স্বপ্ন দিলেন। অবিলম্বে ধনপতি দেশে ফিরিয়া আসিল। খুল্লনাও স্বামীর আদরে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার পর ধনপতির পিতার শ্রাদ্ধকাল আসিলে ধনপতি নিমন্ত্রণ দিয়া দেশবিদেশের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী আনাইল। তাহারা সবাই আসিল কিন্তু ধনপতির গৃহে আহার করিতে রাজি হইল না, কেননা খুল্লনা অরক্ষিত অবস্থায় একবছর ছাগল চরাইয়াছে, তাহাতে তাহার চরিত্রভ্রংশ অবশ্যই ঘটিয়া থাকিবে। নিজের চরিত্রশুদ্ধি প্রমাণ করিবার জন্য খুল্লনা পরপর অনেক রকম পরীক্ষা দিল কিন্তু জ্ঞাতিরা তাহা স্বীকার করিল না। অবশেষে যখন অগ্নিপরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইল তখন সকলে ধন্য ধন্য করিয়া বিবাদ মিটাইয়া

লইল। মাস কতক পরে রাজভাণ্ডারের প্রয়োজনে ধনপতিকে সিংহলে যাইতে হইল। খুল্লনা তখন পাঁচমাস গর্ভবতী, তাহার গর্ভে দেবীর বরপুত্রের সঞ্চার হইয়াছে। (শিবের প্রদত্ত পুরস্কার হাড়মালা অবজ্ঞা করায় দেবনট মালাধর খুল্লনার গর্ভে আশ্রয় করিয়াছে।) সাত ডিঙ্গা লইয়া বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইবার আগে ধনপতি খুল্লনাকে ঘটে দেবীর পূজা করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হয় এবং সে ঘট পায়ে ঠেলিয়া দেয়। এই অপরাধে তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য দেবী ঝড়বৃষ্টি করিয়া ও বান ডাকাইয়া সাগরসঙ্গমে তাহার ছয় ডিঙ্গা ডুবাইলেন। অবশিষ্ট এক ডিঙ্গা লইয়া সাধু সিংহলে পৌঁছিল। সিংহল বন্দরের অবিদূরে সমুদ্রবক্ষে দেবী তাহাকে এক মায়াদৃশ্য দেখাইয়া বঞ্চনা করিলেন। সমুদ্রের মাঝখানে এক বিপুল পদ্মবন, তাহাতে এক বিশাল প্রস্ফুটিত পদ্ম। সেই পদ্মের উপর বসিয়া এক অপূর্ব-সুন্দরী ষোড়শী কন্যা একটি হাতিকে ধরিয়া বারবার গিলিতেছে ও উগরাইতেছে। (এই দৃশ্য ধনপতি ছাড়া কাহারও দৃষ্টি-গোচর হয় নাই।) সিংহলের রাজসভায় ধনপতির অভ্যর্থনা ভালোই হইয়াছিল কিন্তু কমলে-কামিনী দৃশ্যের কথা বলিয়া ফেলিয়া সে মুস্কিলে পড়িল। রাজাকে এ দৃশ্য দেখানো গেল না। তাহার কথা মিথ্যা জানিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন।

এদিকে উজানিতে খুল্লনা পুত্র প্রসব করিয়াছে। নাম রাখিয়াছে শ্রীপতি (শ্রীমন্ত)। ছেলেকে সে সযত্নে লালন করিয়া পুরোহিত পণ্ডিত জনার্দনের কাছে পড়িতে পাঠাইয়াছে। লেখাপড়ায় শ্রীপতির খুব আগ্রহ, এগার বছর বয়সেই সে পণ্ডিত হইয়াছে এবং গুরুর সহিত শাস্ত্র বিচার করিতে চায়। একদিন গুরুশিষ্যের তর্ক-তর্কিতে বালক শ্রীপতি মাথা গরম করিয়া ব্রাহ্মণজাতির প্রতি কটাক্ষ করিল। ক্রুদ্ধ জনার্দন তাহাকে জারজ বলিয়া গালি দিলেন। মর্মাহত হইয়া শ্রীপতি ঠিক করিল, সে পিতার সন্ধান করিয়া আপনার জন্ম-অপবাদ ঘুচাইবে। অনেক নির্বন্ধের পর মাতার সম্মতি ও রাজার অনুমতি পাইয়া সে সাত ডিঙ্গা ভাসাইয়া বাণিজ্য উপলক্ষ্য করিয়া পিতার উদ্দেশে সিংহল অভিমুখে চলিল। দেবীর প্রসন্নতায় যাত্রাপথে কোন বিঘ্ন ঘটিল না। তবে সিংহল বন্দরের মোহনায় সেই মায়াদৃশ্য কমলে-কামিনী সেও দেখিল, তাহার সঙ্গী আর কেহ দেখিল না। তাহার পর শ্রীপতির অদৃষ্টে পিতার লাঞ্ছনার অনুরূপ ঘটিল। তবে এবারে বিদেশী বণিকের মিথ্যা কথায় রাজা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীপতির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু দেবীর বিরোধিতায় সে আজ্ঞা পালন করা গেল না। উপরন্তু দেবীর রোষে রাজবল সমূলে ধ্বংস হইল। অগত্যা সিংহলের রাজা সালবান (শালিবাহন) মহামায়া-দেবীকে প্রসন্ন করিতে তাঁহার পূজা অঙ্গীকার করিলেন এবং শ্রীপতিকে তাঁহার একমাত্র কন্যা সমর্পণ করিলেন। সে ঘটনার পূর্বে দেবী নিহত সিংহল বীরদের সব পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন। কারাগার হইতে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইল। অনেক কষ্টে শ্রীপতি তাঁহার পিতাকে খুঁজিয়া পাইল। রাজা ধনপতিকে খুবই খাতির করিলেন। তাহার পর শ্রীপতি পিতা ও পত্নী সিংহল-রাজকন্যা সুশীলাকে লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিল। পথে সাগরসঙ্গমের কাছে মগরার দেবী ধনপতির নিমজ্জিত ছয় ডিঙ্গা যথাযথ উদ্ধার করিয়া দিলেন। দেশে ফিরিয়া শ্রীপতিকে শেষ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইল। উজানির রাজা বিক্রমকেশরী আবদার করিলেন যে তাঁহাকে সেই দেশে মাটির উপর কমলে-কামিনী দেখাইতে হইবে। শ্রীপতির খাতিরে স্থলভূমিতে, মশানে দেবী তাঁহার কমলে-কামিনী রূপ সকলকে দেখাইলেন। রাজা বিক্রমকেশরী তাঁহার কন্যাকে শ্রীপতির হাতে সমর্পণ করিলেন। কলিকালে মর্ত্যভূমিতে দীর্ঘকাল থাকা বড়ই কষ্টকর, এই সত্য বুঝাইয়া দেবী অবশেষে খুল্লনা শ্রীপতি ও তাহার দুই পত্নী—স্বর্গভ্রষ্ট এই চারজনকে লইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তিনি ধনপতিকে এই সান্ত্বনা দিলেন যে লহনার গর্ভে তাহার বংশধর পুত্র জন্মিবে। তৃতীয় ও শেষ কাহিনীর এইখানেই সমাপ্তি। তাহার পর "অষ্টমঙ্গলা" নামে "অনুবাদ" (সংক্ষিপ্তসার) এবং প্রার্থনাদির পর গ্রন্থ শেষ।

বণিক-খণ্ডের কাহিনী দুটি পৃথক গল্পের সংযোগে গড়া বলিয়া অনুমান করি। এই অনুমানের কয়েকটি সূত্র আছে। প্রথমত, দুই পুরুষের—মাতার ও পুত্রের—অভিশাপপ্রাপ্তি একসঙ্গে নয়, মর্তে অবতার তো একসঙ্গে নয়ই। মনে হয়, রত্নমালার অভিশাপপ্রাপ্তি ও খুল্লনার দুর্গতি কালকেতুর ও শ্রীমন্তের কাহিনীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত। দ্বিতীয়ত, কালকেতু ও শ্রীপতি, দুই জনেরই জন্ম শিবের অভিশাপে, কিন্তু খুল্লনার জন্ম দেবীর অভিশাপে। নীলাম্বরকে ও মালাধরকে শাপ দিবার কারণ বোঝা যায়, রত্নমালাকে শাপ দিবার কারণ স্পষ্ট নয়। দেবী অকারণেই কামদেবকে দিয়া রত্নমালার নাচে তালভঙ্গ করাইয়াছিলেন। বণিক্-খণ্ডের খুল্লনা আখেটিক-খণ্ডের ফুল্লরার প্রতিযোগী, সন্দেহ নাই। খুল্লনা দেবীর অনুগৃহীতা, ফুল্লরা যেন দেবীর প্রতিদ্বন্দ্বী। সেদিক দিয়া খুল্লনার গল্পে সার্থকতা বেশি। কিন্তু আখেটিক-খণ্ডের দেবী আর বণিক-খণ্ডের দেবী তো এক নয়। অথচ খুব ভিন্নও নয়। কালকেতুকে যিনি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন তিনি অরণ্যানী চণ্ডী, আরণ্য জীবের মাতা ও ধাত্রী। গভীর অরণ্যের প্রাণিদের হিতের জন্যই তিনি "ছল গোধিকা" হইয়া কলিকেতুকে ঐশ্বর্যবর দিয়াছিলেন। খুল্লনাকে যিনি বর দিয়াছিলেন তিনিও বনদেবতা তবে অরণ্যানী বা গভীর বনের ধাত্রী-মাতা নন, তিনি সকল পশুর রক্ষয়িত্রী নন, প্রাণীর বিশেষ দুর্গতির—রণে-বনে হারানো-পাওয়ার দেবতা, মাঠে-ঘাটে দিশাহারার উদ্ধারকারিণী। তৃতীয়ত, খুল্লনার দুর্গতিহারিণী ও ধনপতির দুর্গতিকারী এবং শ্রীপতির জয়দায়িনী দেবী এক নন। খুল্লনার দেবী স্থলদেবতা, আর ধনপতিকে বিড়ম্বিত করিয়াছিলেন এবং শ্রীপতিকে সৌভাগ্য দিয়াছিলেন যে দেবী তিনি জলদেবতা। শ্রীপতির দেবীর সঙ্গে কালকেতুর দেবীর যোগাযোগ আছে বৈপরীত্যে। কালকেতুর দেবী স্থলদেবতা, তাঁর প্রতীক গোধা, শ্রীমন্তের দেবী জলদেবতা, তাঁর প্রতীক—কুম্ভীর-মকর নয়—পদ্ম ও হস্তী। একজন অভয়া দুর্গা আর একজন গজলক্ষ্মী (বা মনসা)। এই দুই দেবতা যাঁহারা বাঙ্গালীর পুরাণকথায় চণ্ডী ও মনসা রূপে দেখা দিয়াছেন তাঁহারা গোড়ায় একটি দেবতা ছিলেন—বিষ্ণু-মাধবের শক্তি দেবতা। প্রাচীন পুরাণকাহিনীতে ইনি 'একানংসা' নামে অভিহিত॥

৪

দেবতা-কথা

কবিকঙ্কণের দেব-খণ্ডের কাহিনীর পূর্বভাগ পুরাণ-কাহিনী হইতে নেওয়া। মধ্যভাগ কালিদাসের কুমারসম্ভব হইতে গৃহীত। শেষভাগের মূল-ভাণ্ডার লৌকিক গল্প ও ছড়া। নিজের গৃহস্থালির দারিদ্র্যে শিবগৃহিণী যে কতটা কাতর ছিলেন তাহার একটু ছবি প্রাকৃতপৈঙ্গলে ধৃত একটি লৌকিক ছড়ায় প্রতিবিম্বিত আছে। ছড়াটি এই

বালো কুমারো ছঅমুণ্ডধারী
উবাআহীণা মুই এক্কণারী।
অহংণিসং খাই বিসং ভিখারী
গই ভবিত্তী কিল কা হমারী॥

'ছেলে ছোট, তার ছটা মুখ (অর্থাৎ ছজনের খাবার খায়), আমি একলা মেয়েমানুষ (সংসারে, তায়) সম্বলহীন। (কর্তা) ভিক্ষাবৃত্তি, দিনরাত্রি বিষ (ভাঙ) খায়। কী হইবে আমার গতি!'

আখেটিক-খণ্ডের কাহিনী মুকুন্দ লৌকিক গল্পের মধ্যে পাইয়া থাকিবেন। ২৯ সংখ্যক পদের ভনিতার পাঠান্তর, "মুকুন্দ রচিল গৌরীর লৌকিকের ভাষা" এবং ১০১ সংখ্যক পদের ভনিতা, "শ্রীকবিকঙ্কণ গান গীত ভৃগুবংশ," অনুধাবনীয়। তবে ভৃগুবংশের এখন কোন সন্ধান নাই। কংসে (কাঁসাই) নদের তীরে তিনি যে-দেবীর প্রথম মন্দির

প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হয়ত তমলুকের বর্গভীমা[১] মন্দিরের প্রাচীন ঐতিহ্যবহ। সুহ্মদেশে দামলিপ্ত নগরে (এই স্থান প্রাচীন কংসনদের তীরে) অবস্থিত দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর মাহাত্ম্যের গল্প আছে দশকুমারচরিতের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে। সুতরাং সে দেবীর এমন মাহাত্ম্যকাহিনীর লৌকিক ভাষা হইতে আগত অসঙ্গত অনুমান নয়। ফুল্লরা নামটিও সাক্ষাৎ লৌকিক (অবহট্ট) হইতে নেওয়া বলিয়া বোধ করি।

দেবী গোধা রূপ ধরিয়া কালকেতুর ঘরে আনীত হইয়া তাহাকে ধনদান করিয়াছিলেন, এই ব্যাপারটুকুও খুব প্রাচীনকালের এক বিস্মৃত কাহিনীর রেশ টানিয়াছে বলিয়া মনে করি। বৌদ্ধ-সংস্কৃতে রচিত প্রসিদ্ধ অবদান-গ্রন্থ মহাবস্তুতে যে 'গোধা জাতক' আছে তাহার সঙ্গে মুকুন্দ-বর্ণিত গোধা বৃত্তান্তের অন্তরঙ্গ ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ-কাহিনীটি এখানে সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

বহুকাল পূর্বে বারাণসীতে রাজা ছিলেন সুপ্রভ। তাঁহার একমাত্র পুত্র সুতেজ। রাজকুমারের অশেষ গুণ। অমাত্যবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও শ্রেষ্ঠীরা এবং সহরের ও গ্রামের লোকেরা সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসে। জানিয়া রাজার একান্ত ভয় হইল, আমাকে মারিয়া ইহারা কুমারকে রাজা করিতে পারে। তিনি কুমারকে বনবাসে পাঠাইলেন। সঙ্গে রহিল তাঁহার ভার্যা। তাঁহারা হিমালয় খণ্ডের এক বনভূমিতে তৃণকুটীর আশ্রম নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বনজাত ফলমূল ও শিকার-করা মৃগ-বরাহের মাংস ভক্ষণ করিয়া তাঁহারা কাল কাটাইতে লাগিলেন। সুতেজ একদিন আশ্রমের বাহিরে গিয়াছেন এমন সময় এক বিড়াল এক কুশ্রী গোধা মারিয়া আনিয়া সুতেজের পত্নীর নিকট ফেলিয়া দিয়া গেল। মৃত কুশ্রী পশুটিকে মহিলা হাতেও ছুঁইলেন না। ফল মূল পাতা আহরণ করিয়া কুটীরে আসিয়া কুমার গোধাটিকে দেখিলেন, পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে ওটা বিড়ালে ফেলিয়া গিয়াছে। কুমার বলিলেন, এটাকে সিদ্ধ করিয়া রাখ নাই কেন। পত্নী বলিলেন, গোবর ডেলা মনে করিয়া পাক করি নাই। কুমার বলিলেন, এ তো অভক্ষ্য নয়, মানুষের ভক্ষ্য। এই বলিয়া কুমার ছাল ছাড়াইয়া গোধাটি আস্ত সিদ্ধ করিলেন এবং উঠানে গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিলেন। পত্নী ঘড়া লইয়া জল আনিতে গেলেন। বলিয়া গেলেন, জল আনিয়া আসিয়া আহার করিব। সিদ্ধ করা গোধা দেখিয়া তাঁহার খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। ইহা বুঝিয়া রাজকুমার ভাবিল, যতক্ষণ সিদ্ধ করা হয় নাই ততক্ষণ এই রাজকন্যা গোধাকে ছুঁইতেও চাহে নাই, যখন সিদ্ধ হইল তখন খাইতে উৎসুক। আমার উপর ইহার যদি ভালোবাসা থাকিত তবে আমি যখন ফলমূল আহরণে গিয়াছিলাম তখনই রাঁধিয়া রাখিতে পারিত। সুতরাং আমি ইহাকে ভাগ না দিয়া গোটা গোধাটাই খাইব। রাজকন্যা জল আনিতে গেলে রাজকুমার গোধাটি খাইল। কুমারপত্নী ফিরিয়া আসিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, গোধা কই? স্বামী বলিল, পলাইয়া গিয়াছে। কুমার পত্নী ভাবিল গাছে ঝোলানো আস্ত সিদ্ধ করা গোধা পলাইল কি করিয়া। তাহার ধারণা হইল, স্বামী তাহাকে আর পছন্দ করেন না। তাহার মন খারাপ হইয়া গেল।

কিছুদিন পরে রাজা সুপ্রভ কালগত হইলেন। অমাত্যেরা আসিয়া কুমার সুতেজকে লইয়া গিয়া রাজ-সিংহাসনে বসাইল। রাজরানী হইয়া রাজার সর্বস্বের অধিকার পাইয়াও কুমারপত্নীর মনের আগুন নিবিল না। (এই গল্পের প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, সে জন্মে তিনিই ছিলেন সুতেজ, আর তাঁর যে পত্নী তিনি ছিলেন যশোধরা।)

এই জাতক-কাহিনীর সঙ্গে কবিকঙ্কণের বর্ণিত কাহিনীর মিল এই ভাবে দেখানো যায়,

---

১ নামটি অদ্ভুত রকমের। অনুমান করি এখানে 'বর্গ' ফারসী শব্দ, অর্থ, (১) 'বরগ' হইলে—বাদ্যযন্ত্র, ঘণ্টা, (২) 'বহ্‌রগান্' হইলে—নাবিক। দুইটি অর্থই খাটে। অরণ্যানীর ঘণ্টার উল্লেখ ঋগ্‌বেদে আছে। সমুদ্রপথের অদূরে চণ্ডী নৌপালিনী হওয়া স্বাভাবিক।

১ দুই কাহিনীতেই নায়ক-নায়িকা তৃণকুটীর-নিবাসী এবং বন্যফলমূলাশী ও মৃগয়াজীবী

২ দুই কাহিনীতেই নায়ক গোধার (বা দেবীর) প্রতি অপ্রসন্ন নয়, নায়িকা অপ্রসন্ন

৩ দুই কাহিনীতেই গোধা-প্রাপ্তির পর নায়কের রাজ্যলাভ।

জাতক-কাহিনীতে গোধা স্বেচ্ছায় আসে নাই অনিচ্ছায়ও আসে নাই। তাহার মৃতদেহ আনীত হইয়াছিল। কালকেতু গোধাকে মারিয়া আনে নাই, ধরিয়া বাঁধিয়া আনিয়াছিল এবং গোধিকা স্বেচ্ছায় ধরা দিয়াছিল। মনে হয় মুকুন্দের গল্পের পুরানো রূপে গোধিকা কালকেতুর মৃগয়ার পশু হইয়া মৃতাবস্থায় আনীত হইয়াছিল। আর জাতক গল্পটির প্রাচীনতর রূপেও সম্ভবত সুতেজই শিকার করিয়া আনিয়াছিল। এই অনুমানের দুইটি সূত্র। প্রথমত কোন বিড়ালের পক্ষে "বঠরা রৌদ্রী গোধা" কে মারিয়া আনা সম্ভব নয়। বোধ হয় জাতক-কাহিনীটি যিনি লিখিয়াছিলেন তিনি গোধা বলিতে গৃহগোধিকা অথবা গিরগিটি বুঝিয়াছিলেন। গৃহগোধিকা ও গিরগিটি নিতান্ত ক্ষুদ্রকায়, এবং মানুষের খাদ্য কখনই ছিল না। গোধা সুখাদ্য এবং আয়ুর্বেদে প্রশস্ত মাংস বলিয়া উল্লিখিত। দ্বিতীয়, রাজকুমার যদি শিকার করিয়াই না আনিবেন তাহা হইলে এমন প্রত্যাশা করেন কিসে যে তাঁহার আগমনের আগেই পত্নী জম্বুটিকে রাঁধিয়া রাখিবেন? সুতরাং রাজপুত্র প্রথমে গোধা শিকার করিয়া আনেন তাহার পর ফলমূলের জোগাড়ে দ্বিতীয়বার বাহির হন, কালকেতু যেমন ঘরে গোধা আনিয়া ফুল্লরাকে সখীগৃহে "খুদসের" ধার করিতে পাঠাইয়াছিল।

দেবী চণ্ডীর সহিত গোধার সম্পর্ক অনেকদিনের। প্রথমে গোধা-গোধিকা ছিল দেবীর এক অঙ্গ—দুর্গম শিখরে গমনপথের দিশারী অথবা সর্পহন্তা। প্রাচীন বিদিশার অদূরবর্তী উদয়গিরি পর্বতের গুহায় যে অষ্টাদশভুজা বিরাট দেবীমূর্তি অঙ্কিত আছে সে মূর্তির এক হাতে আছে গোধা। এই গুহা খোদাই হইয়াছিল গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ দেবীমূর্তিতে গোধা সাধারণত পাদপীঠরূপে আঁকা থাকে। মুকুন্দের কাব্যে বন্দিতা দেবী দশভুজা নহেন, দ্বিভুজা। তিনি 'অভয়া চণ্ডী (দুর্গা)' পদ্মাসনস্থা,—প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে তিনি অরণ্যানী, সংস্কৃত সাহিত্যে বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা। অভয়া দুর্গার মূর্তিতে পাদপীঠে গোধিকা অঙ্কিত দেখা যায়। (কালকেতু দেবীর স্বরূপ দেখিতে চাহিলে দেবী দশভুজা মহিষমর্দিনী রূপ দেখাইয়াছিলেন। এ দেবীর ঠিক "স্বরূপ" নয়, লোকালয়ে পূজিত, সর্বজনপরিচিত, দুর্গার রূপ। দেবীর এই রূপই কালকেতুর জানা ছিল। অন্য রূপ দেখিলে তাহার বিশ্বাস হইত না।)

আখেটিক-খণ্ডে যেমন, বণিক-খণ্ডেও তেমনি দেবী অভয়া চণ্ডী—অরণ্যানী বিন্ধ্যবাসিনী (বিন্ধ্য বা "বিজু" বন মানে যে অরণ্যে পথঘাট নাই, দিশাহারা)। "মৃগাণাং মাতা" তিনি অরণ্যে হারা পশুর, সংসারে হারা মানুষেরও বিপদনাশিনী। কালকেতুর চণ্ডী তেজস্বী পৌরুষের পক্ষপাতিনী, তিনি সোজাসুজি পুরুষের পূজা চান। খুল্লনার চণ্ডী অসহায় নারীর পক্ষপাতিনী, তিনি চান পৌরুষকে দমন করিতে। অন্তঃপুরের খিড়কি দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া তিনি সদর মহলে পূজা প্রত্যাশা করেন। তবে খুল্লনার চণ্ডী পুরাপুরি অরণ্যানী নহেন তিনি অংশত পদ্মা (এবং মনসা)—জলদেবতা। মনসার মতো তিনি ভরাডুবি করান, পুরুষকে কামের ছলনা করিতে তাঁহার বাধে না। এ চণ্ডী যেন পুরাণ-কাহিনীবিনির্গত নন, ইনি আসিয়াছেন লৌকিক কাহিনী হইতে। খুল্লনাকে যিনি অরণ্যে সহায়তা করিয়া তাহাকে পতির ভালোবাসায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তিনি আখেটিক-খণ্ডের চণ্ডীরই আর এক রূপ। কিন্তু তাহার পরে এই কাহিনীতে দেবীর যে প্রকাশ তাহার মধ্যে অরণ্যানী-বিন্ধ্যবাসিনীর সন্ধান নাই।

চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির উপাখ্যানের সঙ্গে মনসামঙ্গলের চাঁদো রাজার উপাখ্যানের কাঠামোর বেশ মিল আছে। বাণিজ্যে ভরাডুবি দুই উপাখ্যানেই সাধারণ ঘটনা। মনসামঙ্গলের উপাখ্যান প্রথমে নাথপন্থী যোগীদের গাথার রূপ

পাইয়াছিল[১] তাই কাহিনীর পরিণতি বংশলোপে। এবং সেই কারণে উপাখ্যানটি ভদ্র সমাজের গার্হস্থ্য আসরে সমাদৃত হয় নাই। মুকুন্দের মতো কোন সুশিক্ষিত কবিও তাই মনসামঙ্গল রচনায় অগ্রসর হন নাই।

মনসামঙ্গল-কাহিনী কবিকঙ্কণের অবিদিত ছিল না। চাঁদ বেনের প্রসঙ্গে তাঁহার এই উল্লেখই প্রমাণ— "ছয় বধূ জার গৃহে নিবসয়ে রাঁড়"।

বণিক্-খণ্ডের একটি ব্যাপার অতিশয় বিচিত্র এবং খুব প্রাচীন। যাঁহারা মিথলজি-ঘটিত অলৌকিকের চর্চা করেন তাঁহাদের কাছে ইহা মূল্যবান্ ঠেকিবে। ভারতবর্ষে শ্রীর ও লক্ষ্মীর (অর্থাৎ কান্তির ও পুষ্টির) প্রতীক ছিল পদ্ম এবং পদ্মাশ্রিতা দেবী, আর সম্পদের প্রতীক ছিল হস্তী (নাগ)। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে কান্তি ও ঋদ্ধিজ্ঞাপক যে স্থাপত্য চিত্র অবিচ্ছেদে পাওয়া যাইতেছে সে হইল কমলবনে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে আসীনা শোভনা নারী, তাঁহার দুই পাশে দুই হাতি শুঁড়ে জলকুম্ভ লইয়া তাঁহাকে অভিষেক করিতেছে। পরবর্তী কালে এই মূর্তি মনসার বিকল্প মূর্তি গজলক্ষ্মী বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। মনে হয় গজলক্ষ্মীর মূর্তি বণিকদের জাতিবৃত্তির লাঞ্ছনরূপে স্বীকৃত ছিল এবং পরে ইহাই তাঁহাদের উপাস্য বিশিষ্ট দেবীমূর্তি রূপে পূজিত হইতে থাকে। ধনপতি ও শ্রীপতিকে দেবী নিজের যে মায়ামূর্তি দেখাইয়াছিলেন তাহাতে হস্তী দেবীকে অভিষেক করিতেছে না, দেবীই হস্তীকে বার বার নিগৃহীত করিতেছেন। বণিকদের লাঞ্ছনের এই বীভৎস রূপ দেখাইয়া দেবী ধনপতি ও শ্রীপতিকে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। অনিষ্টসূচক দুঃস্বপ্ন প্রকাশ করিতে নাই, করিলে তাহা ফলিয়া যাইতে পারে,—এই ছিল তখনকার লোকের ধারণা। ধনপতি ও শ্রীপতি এই মায়াদৃশ্যের কথা রাজসভায় প্রকাশ না করিলে তাহাদের বিপত্তি ঘটিত না, প্রকাশ করিয়াই তাহারা নিদারুণ সঙ্কটে পড়িয়া গেল। কমলে-কামিনী মূর্তিকে তাহাদের ভাগ্যদেবীর ছলনা বলিয়া পিতাপুত্র বুঝিতে পারে নাই। দেবীকে ধনপতি কামদৃষ্টিতে দেখিয়াছিল।

আখেটিক-খণ্ডের দেবীর আসল (অর্থাৎ প্রাচীনতম) রূপ যে কি ছিল সে দেবীর উক্তিতেই আছে। তবে কিছু বিকৃত ভাবে থাকায় এবং প্রাচীন দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান না থাকায় এতদিন ধরিতে পারা যায় নাই। আরণ্য কলিঙ্গভূমির দেউলে পূজা লইয়া

শঙ্কর-সদনে চণ্ডী জান নিজ বেশে
অংশরূপে পূজা নিল কলিঙ্গের দেশে। ৪৯।

এখানে দেবী একাকী পূজিত হইয়াছিলেন, শিবের শক্তি রূপে নয়, শিবের সঙ্গে তো নয়ই। তবুও "অংশ" বলিবার কোন আপাত সার্থকতা দেখা যায় না। আসলে এখানে দেবী কৌমারী রূপে পূজা লইয়াছিলেন। এই রূপে তাঁহার প্রাচীন ও বিশিষ্ট অভিধা পাই 'একানংসা' (একানংশা)। ইহার অর্থ হইল, আইবড় সমর্থ মেয়ে। 'অনংসা' উৎপন্ন হইয়াছে সুপ্রাচীন নস্-ধাতু হইতে (মানে দেহ-সংযোগ করা বা হওয়া)। এই হইতে খুব প্রাচীন দেবতাদ্বয়ের নাম, 'নাসত্য' আসিয়াছে। তাই চণ্ডীর একটি নাম কৌমারী। এই নামের একটুমাত্র সার্থকতা দেখা যায় দুর্গোৎসবে কুমারী-পূজা অনুষ্ঠানে "

৫

তৌলন-কথা

মুকুন্দের রচনা ছাড়াও বাংলায় চণ্ডীমঙ্গল আরও দুই চারখানি পাওয়া গিয়াছে। এ চণ্ডীমঙ্গলগুলি আলোচনা করিলে বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা ও বিন্যাস অনুসারে এগুলিকে তিন থাকে ফেলা যায়,—পশ্চিমবঙ্গের পুথি, উত্তরবঙ্গের

১ এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, কর্তৃক প্রকাশিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

পুথি, পূর্ববঙ্গের পুথি। পশ্চিমবঙ্গের সব চেয়ে পুরাতন চণ্ডীমঙ্গল কবিকঙ্কণ মুকুন্দের। উত্তরবঙ্গের পুরানো চণ্ডীমঙ্গল তথাকথিত মানিক দত্তের। পূর্ববঙ্গের পুরানো চণ্ডীমঙ্গল মাধবানন্দ বা মাধবের এবং রামদেবের। দুই জনেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিন থাকে মূল কাহিনী দুইটিতে মোটামুটি ভিন্নতা নাই। স্পষ্ট ভিন্নতা আছে উপক্রম অংশে এবং নীলাম্বরের ও দেব-নটনীর স্বর্গভ্রংশের মূল কারণে।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম অংশ হইল চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি এবং চণ্ডীপূজার আদি পুরোহিত মানিক দত্তের কাহিনী। দেবীর বাসনা মর্ত্যলোকের পূজা। তাহাতে বাধা ধূম্রলোচন মহিষাসুর। তাহার ভয়ে দেবতারা মর্ত্যভূমে নামিতে সাহস পান না। অতএব দেবী ধূম্রকে বধ করিলেন। দেবীর আদেশে হনুমান তাঁহার পূজা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দিব্য সরোবরের ধারে বিচিত্র দেউল তুলিয়া দিল। দেবী সে মন্দিরে পূজা লইতে আসিলেন, কিন্তু ভক্তের ভিড় না দেখিয়া খুসি হইতে পারিলেন না। তিনি নারদকে বলিলেন, প্রত্যহ নৃত্যগীতে তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেউল জাঁকাইয়া তুলিতে হইবে। নারদ বলিলেন, এ কাজ পারিবে কালা খোঁড়া মানিক দত্ত। দেবী মানিক দত্তকে স্বপ্নে দেখা দিয়া তাহার শিয়রে নিজের পূজাপদ্ধতি—ব্রতকথার পুথিখানি রাখিয়া আসিলেন। দেবীর কৃপায় মানিক দত্তের সব ব্যাধি দূর হইল। মানিক দত্ত লেখাপড়া জানে না। সে শ্রীকান্ত পণ্ডিতের কাছে পুথির মর্ম বুঝিয়া লইল। বাংলায় লেখা হইল তিন শ ষাট পদে চণ্ডীমঙ্গল। (রচয়িতা শ্রীকান্ত ও মানিক উভয়ে, কিংবা একলা শ্রীকান্ত এ কাজ করিয়াছিলেন কিনা বোঝা যায় না।) তাহার পর গানের দল বাঁধা হইল। মানিক দত্ত মূল গায়েন, রঘু আর রাঘব দুইজন দোহার, এবং শ্রীকান্ত পণ্ডিত মার্দঙ্গিক। কলিঙ্গ নগরে আসিয়া তাঁহারা চণ্ডীর গান গাহিয়া ফিরিতে লাগিলেন। নূতন ছাঁদের গান শুনিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া গেল এবং সেই গানের লোভে ঘরে ঘরে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত অনুষ্ঠিত লাগিল। অচিরে এ খবর রাজার কানে গেল। রাজা মানিককে সভায় আনাইলেন। সে দেবীর অনুগ্রহ পাইয়াছে, তাহার এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা তাহাকে কারাগারে আটক করিয়া রাখিলেন। রাত্রিতে দেবী স্বপ্নে রাজাকে ভয় দেখাইলেন। রাজার মতি ফিরিয়া গেল। মানিক দত্তকে খাতির করিয়া রাজা ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা দিলেন দেউলে। দেবী প্রসন্ন হইয়া বর দিতে চাহিলে রাজা বলিলেন, আমার তো কিছু শারীরিক কষ্ট ও সংসারিক অভাব নাই, তবে দিবে যদি তো নবধা-লক্ষণ ভক্তি ও ভালো জ্ঞান দাও। এই হইল মর্ত্যলোকে চণ্ডীপূজা প্রবর্তনের ইতিহাস।[১]

নীলাম্বরের শাপপ্রাপ্তি উপলক্ষে কালকেতুর পূর্বপুরুষ ধবলকেতু-সবলকেতুর উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। নীলাম্বর দেবীর প্রিয় ছিল। শিব তাহাকে শাপ দেওয়ায় দেবী অভিমান করিয়া বাপের বাড়ির দিকে পা বাড়াইলেন। নারদ ও শিব বাধা দিতে গেলে দেবী হাতের একগাছি কাঁকন তাঁহাদের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। কঙ্কণের দীপ্তিতে শিব ভয় পাইলেন। তাঁহার কপাল ঘামিয়া টস টস করিয়া দুই ফোঁটা ঘাম মাটিতে পড়িল। তাহাতে তখনি জন্ম লইল দুই পালোয়ান বীর ধবলকেতু ও সবলকেতু। ধাবমান দেবী ও তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান নারদকে দেখাইয়া শিব তাহাদের বলিলেন, যাও ওই দুইজনকে ধর গিয়া। দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের শাপ দিলেন, তোমরা ব্যাধবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ কর। তাহারা শিবের কাছে ফিরিয়া আসিলে শিব বলিলেন, আমি কিছু করিতে পারিব না যেহেতু মায়ের শাপের কাটান নাই। তবে তোমাদের বংশে কালকেতু জন্মিবে, তাহার বিবাহের সময়ে তোমরা স্বর্গে আসিবে। এই কালকেতুর কাহিনীতে আর কোন বিশেষত্ব নাই, তবে শিব-দুর্গার প্রচ্ছন্ন বিরোধ তলায় তলায় রহিয়া গিয়াছে। ভাঁড়ু দত্ত শুধু ঠক নয়। ভাঁড়ও বটে। ধনপতির কাহিনী বিশেষত্ববর্জিত।

"মানিক দত্ত" শুধু এই নামটি ছাড়া উত্তরবঙ্গের চণ্ডীমঙ্গলে—যে পুথি আমি দেখিয়াছি—তাহাতে এমন কিছু

[১] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পঞ্চম সংস্করণ পৃ ৫০৮-৫১৯।

পাই নাই যাহা মুকুন্দের পরবর্তী কালের নয় বলা যায়। মুকুন্দের কাব্যরচনার কালে চণ্ডীমঙ্গলের কথাবস্তু হয়ত যে মানিকদত্তের পদ্ধতি ("মানিক দত্তের দাণ্ডা") নামে অভিহিত ছিল তাহা কবিকঙ্কণের কাব্যের কোন কোন পুথি ও ছাপা সংস্করণ হইতে জানা যায়।[১] কিন্তু সে উল্লেখ মুকুন্দের নহে, গায়নের উল্লেখ এবং দিগ্‌বন্দনায়। দিগ্‌বন্দনা গায়নদেরই বস্তু। সুতরাং উপরে বর্ণিত মানিক দত্তের কাহিনী অর্বাচীন হইতে বাধা নাই। এই গল্পের মধ্যে যদি কিছু সত্য নিহিত থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে মানিক দত্ত কবি ছিলেন না, প্রাচীন গায়ন ছিলেন মাত্র। ধর্মমঙ্গল-কাহিনীকে মানিকরাম গাঙ্গুলি "লাউসেনি দাঁড়া" বলিয়াছেন। সেই ভাবে "মানিকদত্তের দাঁড়া" মানিকদত্ত-ঘটিত কাহিনীটিই বুঝাইবে, সমগ্র চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনী নয়।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের পুথি উত্তরবঙ্গের, বিশেষ করিয়া মালদহ দিনাজপুর অঞ্চলেই পাওয়া গিয়াছে। দু একটি ছাড়া সবই খণ্ডিত এবং অর্বাচীন পুথি। প্রাচীনতম পুথি অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার নয়।

পূর্ববঙ্গের পুরানো চণ্ডীমঙ্গল কবি দুইজন, "দ্বিজ" মাধবানন্দ (মাধব) ও "দ্বিজ" রামদেব। মাধবানন্দের[২] রচনার পুথি সবই চাটিগ্রাম অঞ্চলের, রামদেবের[৩] পুথি সবই নোয়াখালি-ত্রিপুরা অঞ্চলের। দুই কবির রচনা এতটা ঘনিষ্ঠ যে একই মূল রচনার দুই রূপান্তর বলিতে ইচ্ছা হয়। মাধবানন্দের রচনার বিশিষ্ট কোন নাম নাই, তবে শেষের ভনিতা হইতে 'সারদাচরিত' বলা যাইতে পারে। রামদেবের রচনার নাম 'অভয়ামঙ্গল'। মাধবানন্দের সব চেয়ে পুরানো পুথি দুইটির লিপিকাল যথাক্রমে ১৭৫৯ ও ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দ। কোন কোন পুথিতে রচনাকাল দ্যোতক পয়ার আছে, কিন্তু তাহা হইতে ঠিক তারিখ উদ্ধার করা যায় না।[৪] রামদেবের তিনখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে একখানি অধুনা বিলুপ্ত, অপর দুই খানির লিপিকাল যথাক্রমে ১১৮১ সাল (=১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দ) ও ১২২৮ ত্রিপুরাব্দ (=১৮২৪ খ্রীস্টাব্দ)। শেষের পুথিটিতে শকাব্দ দেওয়া আছে ("ইন্দু বাণ ঋষি বাণ বেদ") পাঁচটি সংখ্যায়—১৫৭৫৪, ঠিক নির্দেশ পাই না। দুইটি রচনাই মুকুন্দের রচনার তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত।

মাধবানন্দ-রামদেবের বর্ণিত কথাবস্তুতে প্রধান বিশেষত্ব হইল উপক্রমে শিবদুর্গার আখ্যান পরিবর্তে মঙ্গল দৈত্যের কাহিনী। দেবীর মঙ্গলচণ্ডী নামের ও তাঁহার মাহাত্ম্যকাব্যের চণ্ডীমঙ্গল নামের "মঙ্গল" অংশের অর্থ ভুলিয়া না গেলে এই ব্যাখ্যা-কাহিনীর উদ্ভব হইত না। (মনে হয় মঙ্গল দৈত্যের ভাবনার নীচে সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল-বাদশাহদের প্রতাপের উত্তেজনা ছিল।) এই কাহিনী মানিক দত্তের ধূম্রলোচন-কাহিনীর স্থানীয়। তাহার পর অভিনবত্ব হইল দেবী-আরাধনার ফলে ইন্দ্রের দুর্গতিদূর। তাহার পর নীলাম্বরের ব্যাপার। দেবতাদের আয়ু সুদীর্ঘ, তবে তাঁহারা অমর নহেন। লোমশ মুনির কাছে এই জ্ঞান পাইয়া নীলাম্বর অমর হইবার জন্য শিবের কাছে যোগতত্ত্ব শিখিতে চাহিল। শিব তাহাকে তাঁহার বিষ্ণুপূজায় ফুল যোগাইবার ভার দিয়াছিলেন। শাপমুক্তির পর নীলাম্বর শিবের কাছে যোগ-উপদেশ পাইয়াছিল।

কালকেতুর উপাখ্যানে অল্প স্বল্প ব্যতিক্রম আছে। কালকেতুর পিতা সিংহের কবলে পড়িয়া নিহত হয় এবং তাহার পত্নী সহমরণে যায়। সিংহের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধের কারণ হিসাবেই সঞ্জয়কেতুর বিনিপাত্ত পরিকল্পিত। কালকেতু-ফুল্লরার সংসারের বর্ণনায় অত্যন্ত অসঙ্গতি আছে। ঘরে কিছুমাত্র সংস্থান নাই, তাই

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পঞ্চম সংস্করণ পৃ ৫০৮।

২ প্রথম ছাপা চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর সংস্করণ (দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯০৫), তাহার পর শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্যের সংস্করণ 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' নামে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২)।

৩ শ্রীআশুতোষ দাস সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭)।

৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পঞ্চম সংস্করণ পৃ ৫২২ ইত্যাদি। ঐ অপরার্ধ, তৃতীয় সংস্করণ পৃ ৩০৫।

মৃগয়ায় গোধাই সই। এ দিকে ফুল্লরা হাটে মাংস বিক্রয় করিয়া কড়ি আনিয়া দিতেছে চাল কিনিবার জন্য, অথচ সখীর কাছে সে গিয়াছে বাঁটি চাহিয়া আনিতে! আর একটি অভিনবত্ব বন-কর্তনে গোধা-বাঘের বিরোধ। আপাতত মনে হয় গোধা বেরুনিয়াদের দলপতির নাম। মূলে হয়ত গোধা ও বাঘের লড়াই ছিল। তৃতীয় অভিনবত্ব, কারামুক্ত কালকেতুর রাজার কাছে মাথা নোঙাইতে অস্বীকার। হস্তী আনিয়া তাহার মাথা নীচু করিতে বাধ্য করিলে হস্তী বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন রাজা কালকেতুকে দেবীর বরপুত্র বলিয়া উপলব্ধি করিলেন।

ধনপতির উপাখ্যানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অভিনবত্ব হইল এই যে ধনপতি লহনা ও খুল্লনা তিন জনেই শাপভ্রষ্ট স্বর্গবাসী। প্রথমে অভিশাপ পাইল মণিকর্ণ ও তৎপত্নী চন্দ্ররেখা। ইহারা যথক্রমে ধনপতি ও লহনা রূপে জন্ম লইল। তাহার পরে শাপগ্রস্ত হইল আর এক অপসরা-নর্তকী, সে হইল খুল্লনা। দ্বিতীয় অভিনবত্ব হইল রাঘব দত্তের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পায়রা উড়ানো। লক্ষপতির কোনই আপত্তি হয় নাই খুল্লনাকে দোজবরে বিবাহ দিতে। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের উল্লেখ নাই, পায়রা-বাজিতে পরাজিত রাঘব দত্তের শত্রুতাই ধনপতির জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে খুল্লনার পরীক্ষা গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল। অপর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ঃ মালাধর শিবের শাপ পায় নাই, দেবীর শাপ পাইয়াছিল। পিতা-পুত্রের বাণিজ্য-যাত্রা পথে একবারও নীলাচলের উল্লেখ নাই।

মাধবনন্দ ও রামদেবের রচনায় মুকুন্দের দাঁড়া হইতে কিছু কিছু বক্রতা ও চ্যুতি থাকিলেও মুকুন্দের রচনা যে পূর্ববঙ্গের কবিদ্বয়ের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এমন বলিতে পারি না। "সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল"—কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর এই ছত্র আমাদের আদর্শ পুথিতে না থাকিলেও অধিকাংশ পুথিতেই আছে। সুতরাং এ ছত্র মুকুন্দের মৌলিক রচনা বলিয়া নেওয়া যায়। এই ছত্র মাধবানন্দ ও রামদেবের শোনা ছিল কিন্তু মানে জানা ছিল না। তাঁহারা ইহা কালকেতুর মুখে দিয়াছেন। মুদ্রিত (১৯৫২) পাঠ অনুসারে মাধবানন্দ লিখিয়াছিলেন, "বেঁকা পিতল-খানি ভাঙ্গামু কথায়ে"। রামদেবের ছাপা (১৯৫৭) বইয়ে পাঠ, "রাঙ্গা পিতলখানি মোরে দিলা কর্মফলে"। রামদেবের মতে দেবী কালকেতুকে দিয়াছিলেন হাতের একগাছি কাঁকন, মাধবানন্দের মতে "ধন"—অনির্দিষ্ট মূল্যবান্ বস্তু। এই "ধন" লইয়া কালকেতু ভাঙাইতে গিয়াছিল সোমদত্তের ঘরে। কাঁকণ লইয়া গিয়াছিল সে সুশীল বেনের কাছে। উভয়ত্রই দেবীর নির্দেশে। বেনের "সুশীল" নামটি মুকুন্দের "দুঃশীল" মুরারি শীলের অবোধ প্রতিধ্বনির মতো।

কোটালের কথায় ক্রুদ্ধ শ্রীপতি উত্তেজনার বশে মূল্যবান টোপর জলে ফেলিয়া দিয়াছিল,—এ কাহিনী আমাদের আদর্শ পুথিতে না থাকিলেও মুকুন্দের মূল রচনায় ছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। এই কাহিনী রামদেবের রচনায় নাই, কিন্তু মাধবনন্দের রচনায় জলে টোপর ভাসানোর উল্লেখ আছে। এখানে কোটাল টোপর লইয়া রাজাকে দেখাইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে জলে ফেলার কোন অর্থই হয় না। অতএব বস্তুটুকু মুকুন্দের রচনা হইতে নেওয়া এবং ব্যাপারটির আসল তাৎপর্য—দেবী কর্তৃক শঙ্খচিলরূপ ধরিয়া তাহা উদ্ধার করা এবং খুল্লনাকে দেওয়া—সম্পূর্ণ হারাইয়া গিয়াছে।

দেবী চণ্ডীর দেবলোকে আদি কীর্ত্তির প্রসঙ্গে মুকুন্দ মঙ্গলদৈত্যের উল্লেখ করেন নাই, করিয়াছেন মধুকৈটভ বধ করিয়া ব্রহ্মার নিস্তার। তাহার পর দেবতাদের এবং ইন্দ্রের নিস্তারের ইঙ্গিত আছে বটে কিন্তু সে গৌতমের শাপে নয়, দুর্বাসার শাপে। এ সবই পুরাণ-কাহিনী।

মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ
দুর্ব্বাসার শাপে দুঃখী হইল দেবগণ।

সুরলোকে সৃষ্টির করিলে সুররায়
প্রথমে সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায়। ৩৭৮ ॥

৬

গীত-কথা

আগেই বলিয়াছি, সে কালে—যখন অবহট্ট-লৌকিক হইতে নব্য আর্য সাহিত্যের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হইতেছিল তখন—সব ভদ্র রচনাই যথোচিত সুর ও তাল যুক্ত ছিল। সে সব রচনা ছিল দুই রকমের—'গীত' অর্থাৎ গান, এবং 'প্রবন্ধ' অর্থাৎ আখ্যায়িকা। গীত ছোট রচনা, আগাগোড়া তানে তালে অভিব্যক্ত। প্রবন্ধ দীর্ঘ রচনা, কিছু অংশ সুরে গান করা হইত, কিছু অংশ ছন্দে আওড়ানো হইত, কিছু পড়া হইত। গীতগোবিন্দ যে 'প্রবন্ধ' সে কথা গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত আছে।[১] বইটি গানের ও শ্লোকের সমষ্টি, সংহত রচনা। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর ভনিতায়ও বহুবার রচনাটি 'পাঁচালি প্রবন্ধ' (বা 'পাঞ্চালিকা-প্রবন্ধ') বলিয়া উল্লিখিত আছে।

কবিকঙ্কণের রচনাটি প্রায় সাড়ে পাঁচ শ পদের সমষ্টি ("প্রবন্ধ")। (প্রস্তুত সংস্করণে পদের সংখ্যা ৫২৩, তাহার মধ্যে কিছু মূল হইতে বাদ পড়া সম্ভব, কিছু প্রক্ষিপ্ত থাকাও সম্ভব। সব পুথিতে পদসংখ্যা সমান নয়, তবে কোন পুরানো পুথিতেই পদের সংখ্যা পোনে ছ'শ'র বেশি নয়। প্রত্যেক পদের শেষে কবির ভনিতা। কিন্তু কি পুথিতে কি ছাপা বইয়ে (এবং প্রস্তুত সংস্করণেও) সব ভনিতা-ছেদই মৌলিক অর্থাৎ কবিকৃত নয়। গায়নেরা প্রয়োজন মতো দীর্ঘ পদকে ছাঁটিয়া ছোট করিয়াছেন এবং একাধিক ছোট পদ জুড়িয়া দীর্ঘ পদে পরিণত করিয়াছেন। সেইজন্য কোন ভালো পুথির দুইটি পদ অপর কোন ভালো পুথিতে ঠিক দুইটি পদ নাও হইতে পারে। যেমন প্রস্তুত সংস্করণে ৭১ এবং ৭২ সংখ্যক পদ দুইটি মা-পুথিতে একটি পদ।

প্রাচীন পুথিতে গানের রাগরাগিনীর নির্দেশ থাকে, তবে সব পদে নয়। কোন প্রবন্ধের সব পদই যে গানের মতো গাওয়া হইত তাহা নয়। কোন কোন পদ আসরে প্রয়োজন মতো দ্রুত আওড়ানো হইত। কোন কোন পদে যেগুলির ভাবার্থ সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া হইত সেখানে গায়নের পুথিতে রাগরাগিনীর উল্লেখ থাকিত না। আমার এই অনুমানের সমর্থন পাই "জাগরণ" অংশে। এই সুদীর্ঘ পালাটি গাওয়া হইত সপ্তম দিবসে সারারাত জাগিয়া প্রভাত পর্যন্ত। এত বড় পালা সারা রাত ধরিয়া একটানা গান করিয়া যাওয়া যে-কোন গায়নের পক্ষেই অসম্ভব, অথচ এমন আনুষ্ঠানিক আসরে একটানা পালার মধ্যে গানে সাময়িক বিরতিও চলে না। সুতরাং এ পালায় অনেক পদ পয়ারছন্দে আওড়ানো হইত অথবা বচনিকারূপে সেগুলির মর্মার্থ বলিয়া দেওয়া হইত। এই কারণেই আমাদের আদর্শ পুথিতে (এবং অন্য প্রাচীন পুথিতেও) জাগরণ পালার খুব কম পদেই রাগের নির্দেশ দেখা যায়।

রাগের নির্দেশে বিভিন্ন প্রাচীন পুথির মধ্যে ঐক্য নাই, কিঞ্চিৎ ঐক্য আছে শুধু "মঙ্গল", "করুণা" ও "ললিত" —এই তিনটি নির্দেশে। এই কারণে প্রস্তুত সংস্করণে রাগের উল্লেখ অনাবশ্যক মনে করিয়াছি। পরিগৃহীত আদর্শ পুথি কোন গায়নের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে লেখা হয় নাই। এই পুথিতে এই রাগগুলির নির্দেশ আছে,—সারেঙ্গি, বসন্ত, মালসি, ভূপাল, বিভাষ, পঠমঞ্জরী, সিন্ধুড়া, করুণা, বারাড়ি, ললিত, ধানশি, মঙ্গল, শ্রী ও মল্লার। প্রথম পাঁচটি রাগের উল্লেখ আছে একবার করিয়া, পঠমঞ্জরী দুইবার, সিন্ধুড়া ও করুণা চারবার, বরাড়ি পাঁচবার, ললিত ছয়বার, ধানশি সাতবার, মঙ্গল আটবার, শ্রীরাগ আটদশবার, মল্লার রাগের পদগুলি দুইচারটি বাদে সবই পয়ারে

[১] "এতৎ করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্"।

লেখা, অন্যরাগের অধিকাংশ পদই ত্রিপদীতে। 'ছন্দ' আছে চারবার, 'ললিতছন্দ' তিনবার, 'ঝাঁপা' দুইবার, 'মালঝাঁপ' একবার। চণ্ডীমঙ্গল যেভাবে গাওয়া হইত তাহার কিছু নির্দেশের সূত্র পাওয়া যায় সো-পুথিতে। এই সূত্র হইল "চালন" (বা "চালান"), "চৌপদি ছন্দ", "পআর ছন্দ গিতে", "ধাবাড়ি", "ছুটা মান", "চৌপদি তিন জনে", "ঝাঁকা মান", "ছুটা জাত (=জতি?)", "বারারি রাগ পআর ছন্দ", "পয়ার ছন্দ ভূপালি রাগ," "চৌপদি ছন্দ ভাট্যালি রাগ", "বারমাসি ছন্দ", "মঙ্গল রাগ সটুপদি ছন্দ", "আলিসা কামোদ রাগ", ইত্যাদি উল্লেখ। এখানে ছন্দ কবিতার ছাঁদ (metre) নয়, গাইবার অথবা নাচের কিংবা বাজনার অথবা নাচ ও বাজনার ঢঙ বলিয়া মনে হয়। কবিকঙ্কণের মূল রচনায় এই অর্থে "ছন্দ" শব্দটির অনেকবার প্রয়োগ আছে। যেমন, "রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ"।

পুথিতে তালের উল্লেখ নাই, আছে মানের। মুকুন্দ নিজে 'তালমান' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই সমস্ত শব্দটি ভাঙ্গিয়াই 'তাল' ও 'মান' শব্দ আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। অনুমান করি 'তাল' মানে ছিল আঘাত (ইংরেজী beat) আর 'মান' মানে ফাঁক (ইংরেজী bar)। 'ছুটা মান' মনে হয় ছোট অর্থাৎ দ্রুততর তাল, 'ছুটা জাত' ছোট বিরাম। 'চালন' আলসাভরে অর্থাৎ টানিয়া টানিয়া গাওয়া।

মুকুন্দের কাব্য সর্গ, পরিচ্ছেদ, উচ্ছ্বাস ইত্যাদি কোন রকম গ্রন্থিতে গাঁথা ছিল না। 'দেব-খণ্ড', 'আখেটিক-খণ্ড' ও 'বণিক-খণ্ড'—এই খণ্ডভাগগুলি মুকুন্দ-কৃত কি না বলিতে পারি না। তবে যেভাবে এক কাহিনী আর এক কাহিনীতে গড়াইয়া গিয়াছে তাহাতে এই খণ্ডবিভাগ মূলগত নয় বলিয়া মনে হয়। আসলে রচনাটি আট দিন ধরিয়া প্রয়োক্তব্য একটি দেবতমাহাত্ম্য গান। যজ্ঞে ও দেবারাধনায় যেমন কর্মকাণ্ড সমাপ্তির পূর্বে কোন বিরতি হইতে পারে না দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তনেও তাই। সুতরাং সমগ্র কাব্যটি এই হিসাবে অখণ্ড।

আনুষ্ঠানিকভাবে গীত হইলে কাব্যটি গাইতে আট দিন লাগিত (আট-দিনের মঙ্গল-গান বলিয়া নামান্তর "অষ্টমঙ্গলা"), সাধারণত মঙ্গলবার দিবা হইতে পরবর্তী মঙ্গলবার দিবা পর্যন্ত। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের প্রায় সব ভালো পুথিতে ও অনেক সংস্করণে সাধারণত গাইবার দিন ও কাল অনুসারে 'পালা' ভাগ দেখা যায়। তবে যে পুথি "পঠনার্থ"—যেমন সাহিত্য সভার আরাণ্ড পুথি—তাহাতে পালা বিভাগ নাই। প্রথম দিনে (মঙ্গলবারে) দিনের বেলায় স্থাপনা, রাত্রিতে বন্দু আরম্ভ। দ্বিতীয় দিনে (বুধবারে) শুধু রাত্রিকালে। তৃতীয় হইতে সপ্তম দিনে (বৃহস্পতি হইতে সোমবার) দিন ও রাত্রি দুই বেলায়ই গান হইত, তবে সোমবারে চলিত সারারাত্রি ধরিয়া (—তাই এই পালার নাম জাগরণ—) এবং অষ্টমঙ্গলা গাইবার কালে অষ্টম দিনে (মঙ্গলবারে) সকাল হইয়া যাইত। এইভাবে আট দিনে (মঙ্গলবার হইতে মঙ্গলবার পর্যন্ত) গীত-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইত।

এমনি দিবা-রাত্রির পালা অনুসারেই প্রস্তুত সংস্করণে কাব্যটি বিভক্ত হইয়াছে॥

৭

কবি-কথা

কবির নাম যে "রাম"-সংযুক্ত মুকুন্দ ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। কোন পুথিতে একবারও এ নাম উল্লিখিত দেখি নাই। অথচ রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন, কবির প্রকৃত নাম "মুকুন্দরাম" (পৃ ৯১১)। কাব্য মধ্যে মুকুন্দ নামটিই পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় "কবিকঙ্কণ" ও "শ্রীকবিকঙ্কণ"—কখনো কখনো। কবি ভনিতাগুলির মধ্যে নিজের পরিচয় সম্পূর্ণভাবে ছড়াইয়া দিয়াছেন। তাহা হইতে জানিতে পারিযে তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল দামিন্যা (বা দামুন্যা)

"নগরে" (অর্থাৎ দেবাধিষ্ঠিত গ্রামে) এবং তিনি গ্রন্থরচনা কালে সুখে বাস করিতেছিলেন আরড়া (বা আড়রা) নগরে (অর্থাৎ রাজাধ্যুষিত গ্রামে)। আরড়া (এখন আঁড়রা) ব্রাহ্মণভূমের অন্তর্গত। সেখানকার রাজার অর্থাৎ ভূস্বামীর পুত্র (পরে রাজা) রঘুনাথের সভাসদ ছিলেন তিনি, এবং সেই রঘুনাথই কবির রচনা জনসমাজে গীত হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। কবির পিতার নাম হৃদয়, খ্যাত ছিলেন তিনি "গুণিরাজ (বা গুণরাজ) মিশ্র" নামে। কবির বড় ভাই ছিলেন "কবিচন্দ্র"। ইনি নিশ্চয়ই খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন তাই তাঁহার উপাধিটিকেই কবি যথেষ্ট মনে করিয়া একবারও আসল নাম করেন নাই। পিতামহ ছিলেন "মহামিশ্র" জগন্নাথ। ইনি বহুকাল আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া দশাক্ষর মন্ত্রে গোপালের উপাসনায় নিরত ছিলেন। ইঁহারা কয়ড়ি গাঁইয়ের ছোটতরফের ("অনুজজাত") বংশের ব্রাহ্মণ ছিলেন, রাঢ়ীশ্রেণীর অন্তর্গত (?), গোত্র সাবর্ণ। প্রপিতামহ মাধব ওঝার নিবাস ছিল কর্ণপুরে। ইনি কোন এক রাজসভায় ধর্মাধিকরণিক ছিলেন। তাঁহাকে বীরাদিগর দত্ত নিজের পুরোহিত করিয়া দামিন্যায় আনাইয়া দেবসেবার অধিকারী করিয়া দেন। একাধিকবার ভনিতায় এই চারটি স্নেহাস্পদের নাম পাওয়া যায় যাহাদের জন্য কবি দেবীর দয়া কামনা করিয়াছেন—শিবরাম (অনেক ভনিতায় প্রাপ্ত), চিত্রলেখা, যশোদা এবং মহেশ। রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন, "কবিকঙ্কণের দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম শিবরাম ও মহেশ এবং কন্যা দুইটির নাম চিত্রলেখা ও যশোদা (পৃ ৯৭)।" শেষের দিকে ভনিতায় এক আধবার "রূপ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান" পাওয়া গিয়াছে। উপরের তালিকায় পুত্রের নাম অবশ্যই আছে, পৌত্রের নামও থাকিতে পারে। কবিরা পৈতৃকসূত্রে দামিন্যায় জমি ভোগ করিতেন। ভনিতায় দুই তিন বার দামিন্যার তাঁহাদের সেবিত দেবতার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে—'চক্র্যাদিত্য', 'রামাদিত্য'। ইনি কবিদের গৃহদেবতার মতো ছিলেন। নাম হইতে অনুমান হয় বিষ্ণু কিংবা সূর্য। গ্রামদেবতা ছিলেন শিব (বা ধর্মঠাকুর)। (চক্রাদিত্য ইঁহার নামও হইতে পারে।) দামিন্যার তালুকদার ছিলেন গোপীনাথ নন্দী। নিকটস্থ সেলিমাবাদ সহরে ইনি থাকিতেন। একটি ভনিতা হইতে জানা যায় যে কবির সঙ্গে ইঁহার সখ্য ছিল। একটি পুথিতে প্রাপ্ত একবার ভনিতায় কবি নিজেকে "দৈবকীনন্দন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ ভনিতা খাঁটি হইলে বুঝিব মুকুন্দের মাতার নাম ছিল দৈবকী।

দামিন্যা—(অধুনা বর্ধমান জেলার রায়না থানার দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত এই দামিনে গ্রামের মধ্য দিয়া বর্ধমান ও হুগলি জেলার সীমারেখা চলিয়া গিয়াছে)—গ্রাম হইতে মুকুন্দ আরড়া—(অধুনা মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার অন্তর্গত, শালবনি রেলস্টেশন হইতে চারপাঁচ মাইল পূর্বদক্ষিণে)—গ্রামে গিয়া সেখানকার ব্রাহ্মণ রাজা পালধি-গাঁই বীরবাঁকুড়া দেবের আশ্রয় লাভ করেন। বাঁকুড়া রায়ের পিতার নাম বীরমাধব। পত্নীর নাম দনা, শ্বশুরের নাম দুলাল সিংহ। ইঁহাদের পুত্র রঘুনাথ। বাঁকুড়া দেব আশ্রয়প্রার্থী মুকুন্দকে ছেলে-পড়ানোয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রঘুনাথ মুকুন্দকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন। তেপান্তর বিলের ধারে দেবী স্বপ্নে গীত রচনা করিতে কবিকে আদেশ দিয়াছিলেন সেই আদেশ অনুসারে এবং রঘুনাথের আগ্রহে মুকুন্দ চণ্ডীমঙ্গল রচনা সম্পূর্ণ করেন। গান করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত রঘুনাথ করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রন্থরচনা কালে বাঁকুড়া রায় ও দনা দেবী জীবিত ছিলেন।

এই পর্যন্ত উপলব্ধি করা যায় ভনিতাগুলি হইতে। এই সব তথ্যের সমর্থন এবং আরও কিছু অতিরিক্ত খবর পাওয়া যায় দুইটি "আত্মপরিচয়" বা "গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণ" পদে। প্রথমটি অল্প দুই চারটি পুথিতেই পাওয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়টি প্রায় সর্বত্র। কবিকঙ্কণের পৈতৃক বাসভূমি দামিনে গ্রামে যে পুথিটি তাঁহার স্বহস্তলিখিত বলিয়া দাবি করা হয় তাহাতে প্রথম পদটিই আছে দ্বিতীয়টি নাই। আমাদের পরিগৃহীত আদর্শ পুথিতে দ্বিতীয় পদটিই আছে, প্রথমটি নাই। অন্য প্রায় সব পুথিতেই তাই। কেবল একটি পুরানো পুথিতে (স ৩৩ ; অত্যন্ত খণ্ডিত ; কালিকাপুরে প্রাপ্ত) পর পর দুইটি পদই রহিয়াছে। প্রথম পদটি আসলে দামিন্যা গ্রামের প্রশস্তি, সুতরাং এ পদটি

প্রথমে দামিন্যায় থাকিতে রচিত বলিয়া আপাতত মনে হইতে পারে, কিন্তু এ অনুমানের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি হইল—দামিনের পুথির এই শেষ ছত্র—"বক্ষ পুত্র পৌত্র তিনযান"। এ ভনিতা কবির রচনা হইলে তাঁহার বেশী বয়সের। দ্বিতীয় পদটি লেখা হয় চণ্ডীমঙ্গল রচনা শেষ হইবার পরে, এমন কি, কিছু কাল গান হইবারও পরে। এই কবিতাটি আমাদের আদর্শ পুথিতে সর্বাগ্রে আছে, গণেশ-বন্দনারও আগে। আর সব পুথিতে এ পদটি আছে স্থাপনা পালার শেষে অর্থাৎ বন্দনা-পদগুলির পরে, মূল কাহিনী শুরু হইবার ঠিক আগে। কেবল একটি পুথিতে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৬১৪১, লিপিকাল ১১৯১ সাল, লিপিস্থান কলিকাতা) পদটি দুইবার আছে। একবার আগে—স্থাপনা-পালার শেষে, আর একবার পরে—সর্বশেষে।

প্রথম পদে কবির যে বংশ-পরিচয় দেওয়া আছে—তপন ওঝা, >তৎপুত্র উমাপতি, >তৎপুত্র মাধব, >তৎপুত্র জগন্নাথ, >তৎপুত্র গুণিরাজ মিশ্র, তৎপুত্র হৃদয় মিশ্র, >তদ্দ্বিতীয় পুত্র—তাহা প্রাচীন মা° পুথিতে একটি ভনিতায় কিছু বিকৃত রূপে মিলিয়াছে। প্রথম পদটিতে অতিরিক্ত আছে গ্রামের ও অধিবাসীদের প্রশংসা। দামিনের পুথি হইতে এই পদটি উদ্ধার করিয়া প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন অম্বিকাচরণ গুপ্ত 'প্রদীপ' পত্রিকায় ১৩১২ সালে।

দ্বিতীয় পদটি কৌতূহলোদ্দীপক এবং সর্বজন-পরিচিত। ইহাতে শ্রোতাদের সম্ভাষণ করিয়া কবি আত্ম-কথা ও কাব্যরচনার ইতিহাস দিয়াছেন। দেশের শাসনকর্তা বদ্‌ল হওয়াতে তখন প্রজারা সবিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত। কবির বন্ধু তালুকদার গোপীনাথ নন্দী নিয়োগী রাজরোষে পড়িয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাই কবি গ্রামের মাতব্বরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া জীবিকার উদ্দেশ্যে (১) সপরিবারে দামিন্যা ছাড়িয়া চলিলেন। পত্নীপুত্র ছাড়া সঙ্গে লইয়াছিল ভাই" (নাম রমানাথ, রামা নন্দী অথবা রামনিধি) এবং/অথবা দামোদর (বা ডামাল) নন্দী। গ্রাম ছাড়িয়া ক্রোশ দেড়েক গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন তাঁহারা ভালিয়া (আধুনিক তেলো গ্রামের নিকটবর্তী ভেলো) গ্রামে। সেখানে বৃপ রায় নামে এক ব্যক্তি তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ পথসম্বল অপহরণ করিলে পর যদু কুণ্ডু নামে এক তেলি ভদ্রলোক এই নিঃসম্বল পথিকদের স্বগৃহে আশ্রয় দিয়া তিন দিন রাখিয়াছিলেন। এই চমৎকার গল্পটিতে মুস্কিল হইতেছে সব পুথিতে বৃপরায়ের দস্যুতার উল্লেখ নাই। রামগতি ন্যায়রত্নের পাঠে আছে, বৃপরায় কেল হিত"। আর এক পাঠে আছে, ভাই নহে উপযুক্ত"। (ভেলো গ্রামে যদু কুণ্ডুর বংশধরেরা অদ্যাপি" বর্তমান বলিয়া অম্বিকাচরণ গুপ্ত লিখিয়াছিলেন ১৩১২ সালে।) সেখান হইতে নুবুন্দ চলিলেন গোড়াই বা মুড়াই (সম্প্রতি মুণ্ডেশ্বরী") নদী বাহিয়া তেউট্যা বা ভেঁউটিয়া (বা কেঁউটিয়া) গ্রামে। (অম্বিকাচরণ বলিয়াছেন এই গ্রামে কবির শ্বশুরালয় ছিল।) সেখান হইতে তাঁহারা দ্বারকেশ্বর পার হইয়া গেলেন পাতুলি পুরী" (আধুনিক পাতুল গ্রামে)। অনেক পুথিতে পাঠান্তর আছে 'মাতুলী পুরী' অর্থাৎ মাতুলালয়। এই পাঠই যথার্থ। 'পাতুল' হইলে গ্রাম 'পুরী" বলার হেতু কি মামার বাড়ি বলিয়া? (অম্বিকাচরণের মতেও এই গ্রামে কবির মাতুলালয় ছিল।) সেখানে (মাতুলবংশের?) গঙ্গাদাস তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সেইখান হইতে কবিরা পরাশর ও আমোদর উত্তীর্ণ হইয়া পৌঁছিয়াছিলেন গোথড়া বা কোঁচড়িয়া (বা গোচড়িয়া) গ্রামে। সেখানে বিশ্রাম লইলেন এক বিলের মতো বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পাড়ে। এখন কবিরা একেবারে সম্বলহীন। সেইখানে বুধু স্নান করিয়া মুকুন্দ শালুক-মূল নৈবেদ্য দিয়া ফোটা শালুক ফুলে ঠাকুর পূজা করিলেন। কানে গেল শিশুপুত্রের কান্না, ভাত খাইতে চায় সে। বিলের জলে উদর পূরণ করিয়া কবি গাছের তলায় শুইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার মা যেন আসিয়া মাথার কাছে বসিয়া। তিনি ঘুমের ঘোরেই বুঝিলেন ইনি মা নন দেবী মহামায়া, তাঁহাকে দয়া করিয়া আশীর্বাদ দিয়া নিজের মাহাত্ম্যগীতি রচনা করিতে বলিতেছেন। দেবী তাঁহার কানে এক অজানা মন্ত্র দিলেন। দেবী আজ্ঞা দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, সেইখানেই যেন এক হাতে তাড়িপত্র আর এক হাতে দোয়াত ধরিয়া মুকুন্দের হাতে কলম গুঁজিয়া দিয়া এবং সেই

কলমে নিজে ভর করিয়া গীতি রচনার সূত্রপাত করিলেন। (কিন্তু রামগতি ন্যায়রত্নের এবং কোন কোন পুথির পাঠে এ ব্যাপার ঘটিয়াছিল পরে।) ঘুম ভাঙ্গিলে পর এই স্বপ্নের কথা তিনি সঙ্গী রামানন্দ (রামা নন্দী বা দামোদর নন্দী) ছাড়া আর কাহারো কাছে ব্যক্ত করিলেন না।

"ভাই" এর প্রসঙ্গে রামগতির পাঠই এখানে গ্রহীতব্য, "দামুন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রামানন্দ ভাই পথে দেখা হৈল তার সনে"। ইনি সম্ভবত গ্রাম সুবাদে ভাই, নাম রামা নন্দী (বা ভামাল বা দামোদর নন্দী)। অম্বিকাচরণের মতে ইনি ছিলেন তন্তুবায়, নিবাস ধনেখালির কাছে আলা গ্রামে।

সেস্থান ছাড়িয়া মুকুন্দ শিলাই নদী পার হইয়া (—কোন কোন পুথির পাঠে শিলাই পার হইবার উল্লেখ নাই—) ব্রাহ্মণভূমির রাজধানী আরড়ায় (বা আড়রায়) গিয়া রাজা বাঁকুড়া রায়ের সভায় উপনীত হইলেন। পরিচয় পাইয়া রাজা মুকুন্দকে আশ্রয় ও ভরসা দিলেন। মুকুন্দ রাজকুমারের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। আরড়া "নগরে" সুখে থাকিয়া কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিতে লাগিলেন।—এই হইল দ্বিতীয় পদটির মর্ম।

আত্মকথা-ঘটিত পদ দুইটিকে অবলম্বন করিয়াই পণ্ডিতেরা মুকুন্দের কালনির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব কবিতা দুইটির অকৃত্রিমত্ব—অর্থাৎ মূলরচনার সমকালত্ব ও সহযোগিত্ব—বিচার করা আবশ্যক। এই আলোচনাকালে মনে রাখিতে হইবে, যে-তথ্য বা সংবাদ ভনিতায় বারবার অথবা অসন্দিগ্ধভাবে পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রামাণিকতা সর্বাগ্রে গ্রাহ্য।

প্রথম পদটিকে কবির আত্মপরিচয় না বলিয়া দামিন্যা-প্রশস্তি বলাই উচিত। কবির আত্মকথা যেটুকু আছে, তাহাতে অভিনবত্ব কিছুই নাই, তাহা সবই ভনিতায় মিলিতেছে। দামিনের পুথিতে শুধু এই পদটিই আছে, দ্বিতীয়টি নাই। রাজধানী আরড়ায় সুখে বসিয়া লেখা গ্রন্থে এ পদটি প্রত্যাশিত নয়। পরে সংযোজিত মনে করিলেই সঙ্গতি হয়। তবে পদটিতে দামিন্যার পরিচয়ের মধ্যে কিছু অসঙ্গতি ও অর্বাচীনত্বের ইঙ্গিত আছে। দামিনে পুথির শেষ ছত্রের পাঠ (যাহা কালিকাপুরের পুথিতে নাই)—"রক্ষ পুত্রপৌত্রে ত্রিনয়ান"—যথার্থ হইলে পদটি কবির প্রৌঢ়বয়সের সংযোজন বলিতেই হয়। তাহার পর চক্রাদিত্য ঠাকুরের কথা ধরি। ভনিতায় একাধিকবার "চক্রাদিত্য" বা "রামচক্রাদিত্য" অথবা "রামাদিত্য" ঠাকুরের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোথাও ঠাকুর শিবের সঙ্গে সনাক্ত নহেন। "রাম" আর "আদিত্য" শিব ঠাকুরের নামে দেখা যায় না। তৃতীয়ত গ্রন্থমধ্যে আখ্যানে ধূসদত্তের উল্লেখ আছে শীর্ষস্থানীয় বণিকদের তালিকায় সর্বাগ্রে। কিন্তু সেখানে দেউলের কোন প্রসঙ্গই নাই। চতুর্থত কবির যজমান ও বন্ধু গোপীনাথ নন্দীর নাম নাই, শুধু আছে "হরি নন্দী ভাগ্যবান্ শিবে দিলা ভূমিদান"। পঞ্চমত "বিখ্যাত স্থান" নামদার দত্ত বংশের "সত্যবান্ কল্পতরু" উমাপতির নাম আছে, কিন্তু বীরদিগর দত্ত যিনি কবির পূর্বপুরুষ উমাপতিকে দামিন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাঁহার উল্লেখই নাই। ষষ্ঠত ঋষি ও সর্বানন্দ নাগের (?) নাম অন্যত্র কোথাও নাই। "বেদান্ত নিগম-পাঠী" কুসান (কুশাল?) পণ্ডিতের কথাও অন্যত্র মিলে না। কোন্ তিন মহাশয়ের—বন্দ্যঘটি ও বাগালপাশি গাঁইয়ের—কুলক্রম কিভাবে হইয়াছিল তাহা অনুমানেরও বাহিরে। (বস্তুত এই ছত্রদ্বয়ই দুষ্ট—"মহাশয়" "মহাশয়" মিল!) সপ্তমত, পিতামহ জগন্নাথ যে গোপালের ভক্ত উপাসক ছিলেন সে কথা মুকুন্দ ভনিতায় অসংখ্যবার বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখানে পাই—"মহামিশ্র জগন্নাথ একভাবে পূজিল শঙ্কর।" মনে হয় পদটি দামিন্যার গ্রামদেবতা শিবের বন্দনার উপলক্ষ্যে রচিত অথবা তদর্থে সংশোধিত হইয়াছিল। প্রথম পদটির শেষ কয় ছত্র ছাড়া, মুকুন্দের রচনা বলিয়া মনে করিতে পারি না। বিশেষ করিয়া দামিন্যার প্রয়োজনেই যেন এই পদটি প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

কালিকাপুরের পুথিতে পদ দুইটি পরপর আছে। প্রথমে ধানসী রাগে "ধ্বনি ধ্বনি কলিকালে রঘুনাথের

কূলে অবতার করিলা শঙ্কর" ইত্যাদি, তার পরেই—রাগরাগিনীর উল্লেখ না করিয়া—"সুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ এই কবি হইল জেমতে" ইত্যাদি। দুইটি পদের মধ্যে ছন্দ ছাড়াও ধারাবাহিকতা আছে, সুতরাং সহসা একসঙ্গে রচিত (এবং প্রক্ষিপ্ত) বলিয়া মনে হইতে পারে।

হয়ত সঙ্গত কারণেই প্রথম পদটির প্রচার হয় নাই, তাই তেমন পাঠান্তরও মিলে না। দ্বিতীয় পদটি সবিশেষ পরিচিত ছিল, এবং বিষয়েও চিত্তাকর্ষক, বলিয়া এই পদটির ছোটখাট অজস্র পাঠান্তর পাওয়া যায়। এই পাঠান্তর-বাহুল্য হইতে পদটির প্রাচীনত্বেরও দিশা মিলে।

দ্বিতীয় পদের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ছত্রটি, 'ধন্য রাজা মানসিংহ" ইত্যাদি, মুকুন্দের কালনির্ণয়ে ঐতিহাসিকেরা চাবিকাঠি করিয়াছেন। (প্রথমেই বলা ভালো যে কোন কোন পুথিতে এবং রামগতি ন্যায়রত্নের পাঠে মানসিংহের নামই নাই, "অধর্মী রাজার কালে" পাঠ আছে। বলা বাহুল্য এ পাঠ স্বীকার করিলেও মানসিংহের নেঠা সম্পূর্ণ চুকিয়া যায় না।) মানসিংহের উল্লেখে বোঝা যায় যে পদটি রচনার সময়ে কবির দেশত্যাগ অনেক পূর্ববর্তী ঘটনা। তিনি দেশের কর্তা, অর্থাৎ সুবেদার (১৫৯৪ হইতে ১৬০৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)। সুতরাং পদটির রচনাকাল ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের আগে নয়। পদটি যদি মূল রচনার অর্থাৎ মুকুন্দ কাব্যটি প্রথমে যেমন লিখিয়াছিলেন সেই পাঠের অন্তর্গত হয় তবে সমগ্র চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধেও এই কালসীমা স্বীকার করিতে হইবে, নহিলে নয়। কিন্তু পদটিকে মূলরচনার (অর্থাৎ প্রথম রচিত সমগ্র পাঠের) অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে বিস্তর আপত্তি আছে। সে আপত্তি উত্থাপন করিতেছি।

প্রথমেই গোপীনাথ নন্দীর ব্যাপার। সেলিমাবাদ নিবাসী গোপীনাথ নন্দী নিয়োগী দামিন্যার তালুকদার ছিলেন, মুকুন্দের সঙ্গে তাঁহার সদ্ভাব ছিল। (সম্ভবত কবিগোষ্ঠী তাঁহাদের পুরোহিত ছিল।) গোপীনাথ নন্দী বিপাক বশে রাজদ্বারে আটক পড়ায় তাঁহার তালুক দামিন্যার প্রজারা বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিল। তখন সুহৃদবর্গের পরামর্শক্রমে মুকুন্দ সপরিবারে অন্যত্র গমনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।—এই ব্যাপার পদটি হইতে বুঝিতে পারি। দেশ ছাড়িয়া যাইবার সময়ে দীর্ঘ পথের অন্ত্যভাগে ক্লান্ত মুকুন্দ স্বপ্নে দেবীর আদেশ পাইয়াছিলেন এবং পরে আরড়ায় গিয়া বীরবাঁকুড়া দেবের আশ্রয় পাইয়া সেখানে থাকিয়া দেবীমাহাত্ম্য-কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন।—এই সংবাদও পদটিতে আছে। স্বপ্নে দেবী-আদেশ পাওয়ার কথা একাধিক ভালো পুথিতে ভনিতায় পুনঃপুন পাওয়া গিয়াছে। যেমন, "স্বপ্নে আদেশ পান শ্রীকবিকঙ্কণ গান পরিতুষ্টা জাহারে ভবানী", "সপনে আদেশ পান শ্রীকবিকঙ্কণ গান দামিন্যায় জাহার বসতি," "বনে তেপান্তরে আজ্ঞা কৈল মোরে সঙ্গীত হৈল নির্মাণ", "তেপান্তর বিলে মোরে আজ্ঞা কৈলে"। কিন্তু গোপীনাথ নন্দীর দুর্গতি এবং মুকুন্দের পিতৃভূমি পরিত্যাগ কোন পুথির কোন ভনিতারই সমর্থিত নয়। বরং বিপরীত কথা আছে। একাধিক ভালো পুথিতে পাওয়া (খুল্লনার দুর্গতি প্রসঙ্গের শেষে) একটি ভনিতা হইতে প্রমাণিত হয় যে কাব্যরচনা কালে—ধনপতির কাহিনীর গোড়ার দিকে অন্তত—গোপীনাথ নন্দী স্বচ্ছন্দে তালুক ভোগ করিতেছিলেন এবং দামিন্যার সহিত কবির যোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল। ভনিতাটি এই

দামিন্যা-নগরে চক্রাদিত্য সুর
সেবনে জড়িমা করয়ে দূর।
নন্দী গোপীনাথ জাহে ঠাকুর
কৌতুকে রচিল মুকুন্দ পুর।[১]

[১] সুর=সূর্য অথবা দেবতা। পুর=পুরুত, পুরোহিত। মুকুন্দেরা নন্দীদের যাজক ছিলেন, মনে হয়। শিব পূজার জন্য মুকুন্দের পূর্বপুরুষকে যিনি ভূমি-দান করিয়া ছিলেন সেই হরি নন্দী গোপীনাথেরই পূর্বপুরুষ হওয়া সম্ভব।

বস্তুত মুকুন্দ দামিন্যা হইতে আরড়া গিয়াছিলেন ঠিকই এবং সুখে থাকিবার জন্য যাওয়া সুতরাং সেখানে সুখে ছিলেনও, কিন্তু পিতৃভূমিকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এমন ধারণা সঙ্গত নয়। ভনিতায় তিনি বারবার বলিয়াছেন,—"দামিন্যায় জাহার বসতি"। আরড়ার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সুখে থাকি আরড়া নগরে"। মনে হয়, দামিন্যা ছিল তাঁহার নিবাস সাকিন, আরড়া ছিল তাঁহার কর্মস্থল মোকাম।

পদটিতে উল্লিখিত আছে দামিন্যা ছাড়িয়া যাইবার সময়ে ছিল "সঙ্গে ভাই রামানন্দ"। নামটির পাঠান্তর পাওয়া যায় "রামা নন্দী", "রামনাথ", অথবা "রামনিধি"। মুকুন্দ শুধু তাঁহার বড়ভাই কবিচন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। "কবিচন্দ্র" উপাধি, নাম নয়। সে বড় ভাই ইনি অবশ্যই নহেন। আরও একটু বক্তব্য আছে। পরে, স্বপ্নদর্শন প্রসঙ্গে এই কথা আছে,—"সঙ্গে দামোদর নন্দী জে জানে স্বপ্নের সন্ধি," পাঠান্তর "ডামাল (বা দামাল অথবা মড়াল) নন্দী"।[১] বিদেশ যাত্রার প্রারম্ভে ও উপান্তে উল্লিখিত নাম দুইটি নিশ্চয়ই একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করিতেছে। এ বিষয়ে আগে আলোচনা করিয়াছি।

তাহার পর রূপ রায় ও যদু কুণ্ডুর ঘটনা। প্রচলিত পাঠে আছে, "রূপ রায় নিল বিত্ত যদু কুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা"। কোন কোন পুথিতে পাই "রূপ রায় দিল বিত্ত"। আর গৌহাটীর পুথিতে যদু কুণ্ডু তেলির কোন উল্লেখই নাই ("ভাঙ্গিলায়ে উপনীত রূপরায় দিল বিত্ত জাতিকুল সেহি কৈল রক্ষা")।

যদু কুণ্ডুকে স্বীকার করিলেও খট্‌কা রহিয়া যায়। যদু কুণ্ডু কবিদের আশ্রয় এবং "তিন দিবসের দিল ভিক্ষা"। মুকুন্দ ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুতরাং এখানে "ভিক্ষা" শব্দের ব্যবহার তাঁহার লেখনীতে প্রত্যাশিত নয়, প্রত্যাশিত ছিল "সিধা"। অতএব এখানে রক্ষার সঙ্গে মিলাইবার জন্যই 'ভিক্ষা' শব্দটির ব্যবহার হইয়াছে। এবং সে মিল ভালোও নয়। রূপরায় ব্রাহ্মণ হইলে অন্য কথা।

সমস্ত পদটির মধ্যে আতিশয্যের দ্বারা চমৎকৃতি জাগাইবার যে চেষ্টা মাঝে মাঝে আছে তাহা কবিকঙ্কণের কাব্য মধ্যে কোথাও দেখা যায় না। এই চমৎকৃতি-চেষ্টা অংশ—দেশের লোকের দুরবস্থা ও পথে মুকুন্দের দুর্গতির জ্বলন্ত ছবিগুলি—বাদ দিলে যেটুকু বাকি থাকে তা মুকুন্দের রচনা হইতে কোন বাধা নাই, এবং তাহা হইলে কোন ভনিতার সঙ্গেও বিরোধ ঘটে না॥

৮

রচনা-কাল

'গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণ' কবিতাটির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার পূর্ব পর্যন্ত মুকুন্দের কাব্য-রচনার কাল লইয়া কোন মতভেদ ছিল না। তাহার কারণ রামজয় বিদ্যাসাগরের সম্পাদিত কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যের প্রথম প্রকাশিত সংস্করণে সর্বশেষে কালজ্ঞাপক চার ছত্র ছিল। (পরে ছাপা সংস্করণগুলিতে এবং এক-আধটি পুথিতেও ইহা মিলিয়াছে।) ছত্রগুলি এই

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা
কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা।
অভয়ামঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ
আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ॥ শক ১৪৬৬॥

১ ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে অম্বিকাচরণ গুপ্ত শুনিয়াছিলেন যে দামাল নন্দী ছিলেন তত্ত্ববায়-জাতীয়।

প্রথম দুই ছত্রের অর্থ,—'রস (=৬)[১] রস (=৬) বেদ (=৪) শশাঙ্ক (=১)' এই গণিত বর্ষে, কতদিন আগে, হরগৃহিণী দেবী গানরচনার আদেশ দিয়াছিলেন।'

কোন প্রাচীন পুথিতে না পাওয়াটাই এই তারিখ সরাসরি অগ্রাহ্য করিবার একমাত্র কারণ নয়। গ্রন্থোৎপত্তি-বিবরণের বর্ণনা সত্য বলিয়া মানিলে মুকুন্দ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকের আগে দেশত্যাগ করিতে পারেন না, কেন না তাহা হইলে কোন ক্রমেই মানসিংহকে পাওয়া তো দূরের কথা, ছোঁওয়াও যায় না।

মানসিংহের কথা ছাড়িয়া দিলেও ১৪৬৬ শকাব্দ (=১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) সম্বন্ধে কিছু আপত্তি উঠে। রামগতি ন্যায়রত্ন খোঁজ করিয়া বাঁকুড়া দেবের পুত্র রঘুনাথ দেবের রাজ্যপ্রাপ্তি কাল পাইয়াছিলেন ১৪৯৫ শকাব্দ (১৫৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)। চণ্ডীমঙ্গলের ভনিতায় রঘুনাথকে অনেক সময় "রাজা" অথবা "ব্রাহ্মণভূমির পুরন্দর" বলা হইয়াছে। সুতরাং ভাবা যাইতে পারে যে ১৫৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে কবি গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ১৫৪৪-৪৫ হইতে ১৫৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ ২৯ বছরের তফাৎ। কিন্তু তাহাতে খুব হানি নাই। কালিকাপুরের পুথির ভনিতায় আছে যে কাব্যরচনায় মুকুন্দ দীর্ঘসূত্রিতা দেখাইয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহার পক্ষে শুভকর হয় নাই।

"গীত না করিয়া মৈল্য ছালা"।

কিন্তু এহো বাহ্য। মুকুন্দ যখন কাব্যরচনা করিতেছিলেন তখন যে বাঁকুড়া রায় স্বর্গত এমন মনে করায় বাধ্যতা নাই। রাজবংশের একমাত্র পুত্রের, যুবরাজের, শিক্ষক ও সভাসদ ছিলেন মুকুন্দ। যুবরাজকে রাজার মতো সম্মান দেখানো তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সে কথা যাক। চণ্ডীমঙ্গল রচনা কালে বাঁকুড়া রায় যে জীবিত এবং রঘুনাথ যে যুবরাজ তাহার দৃঢ় প্রমাণ রহিয়াছে ধনপতি-উপাখ্যানে দুইটি—অন্তত তিন চারটি একাধিক ভালো পুথিতে একাধিকবার প্রাপ্ত—ভনিতায়।

দুলাল সিংহের সুতা দনাদেবী পাট-মাতা
কুলে শীলে গুণে অবদাত
তার সুত নৃপরত্ন করিল অনেক যত্ন
বৈরিশল্য[২] দেব রঘুনাথ।
আড়রা তরিয়া ভূমি পুরুষে পুরুষে স্বামী
সেবেন গোপাল কামেশ্বর
নূতন কবিত্বরসে নৃপতির অভিলাষে
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

দুলাল সিংহের সুতা দনাদেবী পাটমাতা
রঘুনাথ তাহার নন্দন
তার আজ্ঞা পরমান মুকুন্দে করয় গান
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

---

১ মুকুন্দরামের সমগ্রে সাধারণ ও পণ্ডিত সমাজে শকাঙ্ক হিসাবে 'রস' ছয় (৬) বুঝাইত। বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রের "অষ্ট নায়িকা" হইতে "অষ্ট রস" উৎপন্ন। তাহা হইতে অষ্ট=৮ হইতে পারে, কিন্তু কোন সিদ্ধ প্রয়োগ নাই। "নব রস" ও "নব রসিক" —আসলে নূতন রস, নূতন রসিক—ছিল। পরে লোকব্যুৎপত্তিতে সংখ্যা অর্থ আসিয়া গিয়াছে। নয় অর্থেও রসের শিষ্ট প্রয়োগ নাই।

২ পাঠান্তর 'বৈরিশুম্ভ'।

মা যেখানে পাটরানী সেখানে ছেলে পাটে-বসা রাজা হইতে পারে না।

এত ভাবি ধনপতি মুকুন্দ করএ নতি
গিরিজার চরণকমলে
বীর-বাঁকুড়া কবির ছন্দ মূর্খে লাগএ ধন্দ
পণ্ডিত বুঝএ কুতূহলে ॥

এই ভনিতায় কবি রাজা বীর-বাঁকুড়া রায়কে সূক্ষ্মভাবে প্রশংসা করিয়াছেন।

চণ্ডীমঙ্গল রচনার কালে রঘুনাথের পুত্র হয় নাই, হইলে অবশ্যই উল্লেখ থাকিত। শেষের দিকে ভনিতায় অনেকবার পাই রঘুনাথের কামনাপূরণের জন্য দেবীর কাছে প্রার্থনা। মনে হয় এ কামনা পুত্রসন্তানের জন্যই, পাটে বসিবার জন্য নয়। রঘুনাথের পুত্র সন্তান হইয়াছিল, নাম চক্রধর। তিনি ১৫২৬ শকাব্দে (=১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে) পিতার মৃত্যুর পর রাজা হইয়াছিলেন (রামগতি), এবং রাজা হইবার পরে এই সালেই কেশিয়াড়ীতে সর্বমঙ্গলার দেউল নির্মাণ-কার্য শেষ হইয়াছিল। উড়িয়া অক্ষরে উৎকীর্ণ মন্দির-প্রতিষ্ঠালিপিতে[১] চক্রধরের নাম আছে রাজা হিসাবে, মানসিংহের উল্লেখ আছে রাজেশ্বর হিসাবে। মানসিংহ বাঙ্গালা-উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন ১৫৯৪ হইতে ১৬০৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

আমার অবলম্বিত আদর্শ পুথিতে পাঠ আছে—"সে মানসিংহের কালে"। ইহার পরিবর্তে—"রাজা মানসিংহ গেলে" এই পাঠ গ্রহণ করিলে 'গ্রন্থোৎপত্তি বিবরণ' পদটিকে ১৬০৪—০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত বলাই যায় না। কিন্তু ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দে রচনা সাঙ্গ হইলে চক্রধরের উল্লেখ নাই কেন? চণ্ডীমঙ্গল প্রথম গীত হইবার সময়ে যে পদটির পূর্ণ অস্তিত্ব ছিল না তাহা শেষের দিকে উল্লিখিত কবি ও গায়েনকে পুরস্কার দানের বিবরণ হইতে বোঝা যায়।

অতএব "শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ" ইত্যাদি পদটি পরে রচিত ও সংযুক্ত হইয়াছিল। এ সংযোজন যে কবি নিজে করেন নাই, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তবে কবির নিজকৃত সংযোজন সবটা নয়, পদটির গোড়ার দিকে অপরের প্রক্ষেপ থাকা অধিকতর সম্ভব।

"উজির হইল রায়জাদা"—হয়ত এই উক্তিতে উজির খাঁ-র (Wazir Khan) কথা বলা হইয়াছে। ইনি ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন, এবং ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহা হইলে, এই পাঠ ধরিলে, এই প্রক্ষিপ্ত অংশের রচনাকাল ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগে যাইবে না।

এখন কাব্যরচনা কালের আলোচনা করি। প্রথমেই ধরিতে হয় শকাঙ্ক পদটি। পদটি রামজয় বিদ্যাসাগরের সংস্করণে আছে কিন্তু এটি তাঁহার প্রক্ষেপ নয়। ১২৪৮ সালে (১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে) লেখা শেষ করা এক পুথিতে (পৈয়ালি পুথি) এই শকাঙ্ক আছে। রামজয়ের ছাপা বই দেখিয়া এ পুথিটি লেখা হয় নাই। দুইটি পুস্তকের মধ্যে পাঠেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সুতরাং এই পুথির আদর্শ পুথিতে—এবং তাহা রামজয়ের আদর্শ পুথি নয়—এই শকাঙ্ক-নির্দেশ নিশ্চয়ই ছিল। বিকর্তন মিশ্রের ও হীরাবতীর পুত্র এক মুকুন্দ মিশ্র মার্কণ্ডেয়-

---

১ লিপিটি এই (শ্রীবিনয় ঘোষের প্রবন্ধ, যুগান্তর ২৬ শ্রাবণ ১৩৬২ সংখ্যা)

শ্রী মানসিংহ মহারাজ শুভরাজ্যে নিজকুলে কুমুদানন্দ
শ্রীল রঘুনাথ শর্মা ভূমিপসুত শ্রীচক্রধর শর্মা
প্রকাশিলে সর্বমঙ্গলা প্রতিমা স্থিতি। শকাব্দ ১৫২৬।
কামিলা রত্ন পাত্র।

বিশ্বভারতী পত্রিকা (১৩৬০ সালের তৃতীয় সংখ্যা) পৃ ২৫১ দ্রষ্টব্য।

চণ্ডী অবলম্বনে 'বাসুলীমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন।[১] এই রচনাটি যে-পুথিতে পাওয়া গিয়াছে তাহা ১১৪২ সালে (১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) অনুলিখিত। শকাব্দ পদটি মুকুন্দ মিশ্রেরও জানা ছিল। তাই তিনি লিখিয়াছেন

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতে
বাশুলীমঙ্গল গীত হৈল সেই হইতে।

দ্বিতীয় ছত্রটি হইতে জানা যাইতেছে যে এই মুকুন্দ মিশ্র জানিতেন যে চণ্ডীমাহাত্ম্য ("বাসুলী-মঙ্গল") গীত রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল অনেক কাল আগে, ১৪৬৬ শকাব্দ হইতে।

অন্য দিক দিয়া বিচার করিলেও ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ মুকুন্দের আরড়া-গমন কাল ধরিতে পারা যায়। মুকুন্দেরা সেলিমাবাদ-নিবাসী নিয়োগী গোপীনাথ নন্দীর তালুকে বাস করিতেন এবং তালুকদারের প্রদত্ত ভূমিবৃত্তি ভোগ করিতেন। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শের খান গৌড়ের সুলতান মামুদশাহকে পরাজিত করেন এবং পর বৎসর শেরশাহ নাম ধরিয়া দিল্লীর তক্তে বসেন। এই সময়ে পুরানো জমিদারদের খুবই অসুবিধা হওয়া প্রত্যাশিত। মনে হয়, গোপীনাথ নন্দী তেমনি অসুবিধায়ই পড়িয়াছিলেন এবং মুকুন্দের বৃত্তিও সেই সঙ্গে ক্ষীণ অথবা লুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং সাংসারিক স্বচ্ছলতা পুনরুদ্ধারের আশায় ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দের দিকে কবির অন্যত্র গমন অস্বাভাবিক নয়। আরও এক দিক বিবেচনা করিলে এই তারিখের সমর্থন পাই।[২] মুকুন্দের পিতার উপাধি ছিল "গুণিরাজ" বা "গুণরাজ", ব্রাহ্মণ বলিয়া "মিশ্র" (—অব্রাহ্মণ হইলে "খান" হইতেন)। গৌড় দরবারের এমন উপাধি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে পাঠান আমলেই পাওয়া গিয়াছে। পাঠান দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকিলে এমন উপাধি মিলিত না। সুতরাং মুকুন্দের পিতা "গুণিরাজ-মিশ্র" হয়ত যে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের অথবা তাঁহার পূর্ববর্তী সুলতানের হিন্দু কর্মচারী-পুষ্ট সভায় সংবর্ধনা পাইয়াছিলেন এমন অনুমান অযৌক্তিক নয়। মুকুন্দের কাব্য পাঠ করিলে তাঁহার যে ফারসী ভাষায় বেশ জ্ঞান ছিল এ ধারণা জন্মায়। গুজরাট নগর-পত্তন বিবরণ পড়িলে মনে হয় যে গৌড়ের মতো কোন পুরাতন রাজধানী হয়ত তাঁহার দেখা অথবা জানা ছিল। মুসলমান সমাজের সম্বন্ধে মুকুন্দের অভিজ্ঞতা যে সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অপেক্ষা অনেক ঘনিষ্ঠ ছিল তাহাও দুর্লক্ষ্য নয়। আরও একটা কথা। মুকুন্দের পিতামহ "মহামিশ্র" জগন্নাথ নিরামিষ চর্য্যা করিয়া দশাক্ষর মন্ত্র জপিয়া গোপালের উপাসনা করিতেন। দশাক্ষর মন্ত্রে গোপাল উপাসনার উপদেশ চৈতন্যের দাদাগুরু মাধবেন্দ্রপুরী এদেশে প্রচলিত করিয়াছিলেন। জগন্নাথ হয়ত মাধবেন্দ্রপুরীর (অথবা তাঁহার সম্প্রদায়ের কাহারও) ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পাইয়াছিলেন। জগন্নাথের সম্পর্কে চৈতন্যের উল্লেখ নাই, অথচ চৈতন্যের মাহাত্ম্য সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন মুকুন্দ।[৩] সুতরাং জগন্নাথকে চৈতন্যের অগ্রজন্মা ধরিতে হয়। এই বিবেচনায়ও মুকুন্দের দেশত্যাগ কাল হিসাবে ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ সমর্থিত হয়।

মুকুন্দ যখন দামিন্যা ছাড়িয়া যান তখন হয়ত তাঁহার পুত্র হইয়াছিল। সে কালে উচ্চবর্ণের সমাজে অল্প-বয়সে বিবাহ হইত। সুতরাং প্রথম সন্তান জন্মের সময়ে তাঁহার বয়স বিশ-বাইশ বৎসর ধরিতে পারি। মুকুন্দ দামিন্যার গ্রামদেবতার বন্দনায় একবার বলিয়াছেন, "কবি হইয়া শিশুকালে রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে"। এ "সঙ্গীত"

---

১ শারদীয় সংখ্যা 'বর্ধমান' ১৩৫৯ পৃ ৬৭৬ দ্রষ্টব্য।

২ এ আলোচনা সম্পূর্ণ নূতন, সেই জন্য মদীয় 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড প্রথমার্ধের আলোচনা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

৩ যে সব পুথিতে বন্দনা পালায় চৈতন্যবন্দনাটী নাই সেখানে তাহা শ্রীপতির বাণিজ্য-যাত্রার কালে নবদ্বীপের প্রসঙ্গে আছে (সো-পুথি, গৌ-পুথি ইত্যাদি)।

হয়ত তাঁহার কাব্যের দেবখণ্ড—যাহাতে শিব-সতী-পার্বতীর কাহিনী আছে। অতএব মুকুন্দের জন্ম ১৫২২-২৪ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি অনুমান করিতে পারা যায়।

শকাব্দ পদটির প্রসঙ্গে আরও একটু বলিবার আছে। চণ্ডীমঙ্গলের কোন কোন পুথিতে পুষ্পিকার মধ্যে অথবা আগে এমন ধরণের শকাব্দ পদ পাওয়া যায় যা আপাতদৃষ্টিতে রচনাকাল বলিয়া মনে হইতে পারে। যেমন কলিকাতায় "বৈটকখানার বাজারের কাছারিতে বসিয়া সন ১১৯১ সালের মাহ ফাল্গুনে ৪ চৌঠা তারিখে শনিবার" লেখা সাঙ্গ করা পুথিতে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৬১৪১)

সকে বসু পুষ্প রস চন্দেতে গণিয়া
অসিত যুক্লা অষ্টমি মেষ জে জিনিয়া।
অষ্টদিবসেতে ক্ষিতি রবিবার
চতুর্বিংশ জ্ঞান তবে করিল প্রচার॥

১৬৫৮ শকাব্দ (অর্থাৎ ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) নিশ্চয়ই আদর্শ পুথির লিপিকাল। তবে তারিখটি অন্যপুথির ("চতুর্বিংশজ্ঞান" পুথির) হওয়াই সম্ভব।

রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের সংগ্রহের একটি পুথিতে—বিষ্ণুপুরে লেখা ১২১৩ সালে—শেষ পাতায় আছে[১]

সাল শাকে বসু পৃষ্ঠে ঠেকিল অম্বর
নির্ঘাত মারিল বাণ চন্দ্রের উপর।
এই শাকে পুথি হইল চণ্ডী অনুভব
ডিল্লীর তক্তেতে তখন বাদসা আরংজেব॥

শকাব্দ সংখ্যায় ভাঙ্গিলে (আরংজেবের খাতিরে) হয় ১৫৮০ শকাব্দ, অর্থাৎ ১৬৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা অবশাই আদর্শ পুথির অনুলিপিকাল। মূল রচনার শতাবধি কাল পরবর্তী।

মুকুন্দরামের কাব্য-রচনাসমাপ্তি কালের উল্লেখ তাঁহার রচনার মধ্যেই আছে। এতদিন তাহাতে চোখ পড়ে নাই মানসিংহের ঠুলি আঁটা ছিল বলিয়া। সে কথা বলি।

তাঁহার পাঞ্চালিকা প্রবন্ধ যিনি প্রথম গান করিয়াছিলেন তাঁহার উল্লেখ আছে দুইটি ভনিতায়। ইহা হইতে জানি যে বিক্রমদেবের (—বাঁকুড়া দেবের জ্ঞাতি ?) পুত্র, তালমানে বিজ্ঞ, প্রসাদ (দেব) ছিলেন মূল গায়েন। এই মর্মে ভনিতা পাই গৌ-পুথিতে আত্মকথা পদে।

বিক্রম দেবের সুত গান করে অদ্ভুত
বাখান করয়ে সর্বজন
তালমানে বিজ্ঞ দড় বিনয়-সুন্দর বড়
নতিমান মধুরবচন।

---

১ শ্রী মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ সংকলিত 'বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের বাংলা পুথির তালিকা', রাজশাহী ১৯৫৬, পৃ ২৫ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় ভনিতাটি সব পুথিতে এবং ছাপা বইয়ে আছে কাহিনীর উপসংহারে অষ্টমঙ্গলায়।

অষ্টমঙ্গলা সায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
অমর সাগর মুনিবরে[১]
চারি প্রহর রাতি জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি
গাইলেন[২] প্রসাদ আদরে॥

এইখানেই প্রথম গাওয়ার তারিখও পাওয়া গেল,—অমর (=১৪) সাগর (=৭) মুনিবর (=৭), অর্থাৎ ১৪৭৭ শকাব্দ (=১৫৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।) পাঠান্তরের বিভ্রান্তি বশে মন্দিরের ধাঁধায় পড়িয়া এই স্পষ্ট তারিখটি এতদিন চোখ এড়াইয়া আসিয়াছে।[৩]

অতএব দৃঢ়তর বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত মানিতে হইবে যে মুকুন্দের আড়রা গমনের (দেশত্যাগ বলিব না) কাল ১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ, এবং কাব্যরচনা-সমাপ্তিকাল ১৫৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে নয়।

এইখানে মুকুন্দের উপনাম কবিকঙ্কণের আলোচনা করি। 'কবিকঙ্কণ' উপাধি নয়, উপাধি হইলে দাতার উল্লেখ অবশ্যই কোন না কোন ভনিতায় থাকিত। এটি স্বয়ংগৃহীত উপনাম। সেকালে পাঞ্চালিকা-প্রবন্ধের গায়ন পায়ে নূপুরের সঙ্গে হাতে কড়াইভরা অথবা ঘুঙুর দেওয়া মলের মতো বালা পরিত। চণ্ডীমঙ্গলের মূল গায়েন অদ্যাপি হাতে এমনি "কঙ্কণ" পরিয়া থাকেন, মান্দরার মতো তাল দিবার জন্য। মুকুন্দ তাঁহার চণ্ডীগানের দলের অধিকারী ছিলেন। তাই এই উপনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আমার অনুমান॥

৯

প্রশস্তি

বিদ্যাবান্ না হইলে ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা না থাকিলে বড় কবি হওয়া যায় না। কবিকঙ্কণ-চক্রবর্তী মুকুন্দ বিদ্যাবান্ ছিলেন, সে পরিচয় তাঁহার রচনায় প্রচুর ছড়াইয়া আছে। সংস্কৃত তিনি ভালো করিয়া জানিতেন, তৎসম শব্দের নিপুণ ব্যবহারে (যেমন, ব্রহ্মবন্দনায়, "হেতু অন্তরায় পতি") বোঝা যায়। ফারসী শব্দের নিপুণ ব্যবহারে এবং গুজরাটে মুসলমান প্রজার পত্তন বিবরণে তাঁহার ফারসী ভাষাজ্ঞানের প্রমাণ আছে। তাঁহার কবিপ্রতিভার কথা বলা বাহুল্য। যে বিশ্বস্ত অন্তরঙ্গতার সুর বৈষ্ণব পদাবলীকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র করিয়াছে তাহা মুকুন্দের রচনায় আগাগোড়া অপর্যাপ্ত না থাকিলেও মাঝে মাঝে অশ্রুত নয়। সেকালের কবিত্বের কারুশিল্পের সব সূত্রই তাঁহার অধিগত ছিল। তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু সংস্কৃত-পণ্ডিত মাত্র ছিলেন না, সংস্কৃত সাহিত্যের বিদগ্ধ রসিক পাঠক ছিলেন তিনি। তাহার প্রমাণ রহিয়াছে পার্বতীর তপস্যায়, বিবাহে নারীদের হুড়াহুড়িতে, রতির বিলাপে, সারির খেদে এবং অন্যত্র কালিদাসের অনুসরণে। প্রাকৃতপৈঙ্গল তাঁহার অধীত ছিল, তাহা বুঝি ছন্দপ্রয়োগের দক্ষতায়। জ্যোতিষশাস্ত্রও তিনি ভালোই জানিতেন, হয়ত ইহাতে তাঁহার অধিকার কুলগত ছিল। (পিতার

১ পাঠান্তর: "শ্রীঅমর সোমের মন্দিরে", "অমর সাগর মন্দিরে", ইত্যাদি। "জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি" মুকুন্দ কাব্যমধ্যে অনেকবার লিখিয়াছেন, সমুজ্জ্বল উৎসবের বর্ণনায়। মনে হয় এখানে "ঘৃতের বাতি" জন্যই "মুনিবরে" মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল কোন কোন পুথিতে।
পাঠান্তর 'গায়েন', 'গায়ন'।

৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৭০, পৃ ৫৩৫ দ্রষ্টব্য।

"গুণিরাজ মিশ্র" অভিধা কি রাজ-দরবারে জ্যোতিষী ছিলেন বলিয়া ?) ফারসী যে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না সে-কথা আগে বলিয়াছি। মুকুন্দের কাব্যের প্রশংসা অনেকে এখনকার পাঠ্যপুস্তকে করিয়াছেন, এখানে সে সব পুনরুক্তির প্রয়োজন দেখি না। • এখানে শুধু এই কথাই বলি যে দেশ ও দেশের ভালো তাবৎ বস্তু মানুষ পশু গাছপালা নদনদী সব—তিনি গভীর অনুভূতির সূত্রে গাঁথিয়া যেন শ্রোতা-পাঠকের প্রত্যক্ষ গোচরে সাজাইয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার কাব্যপটে চিত্র ও চরিত্র মিলিয়া গিয়াছে। তাঁহার রচনায় সেই সবই জীবন্ত। এবং সে সজীবতা মানবীয়। দেবতা-উপদেবতা পশুপক্ষী এমন কি নদনদী তাহারাও যেন মানুষ। কাব্যটি চণ্ডীমঙ্গল, দেবতার ক্রীড়াকাণ্ড মানুষের মতো এবং মানুষকে লইয়া। তাই দেবতাকেও মানুষ সাজিতে হইয়াছে। তাই কাব্যের সব চরিত্রই মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন সাজ পরা।•

দেব-খণ্ড, আখেটিক-খণ্ড ও বণিক-খণ্ড—তিনটি আখ্যানেরই মর্মবাণী বিবাহিত নারীর বেদনা। দেব-খণ্ডে নারীচরিত্র তিনটি, পুরুষচরিত্র একটি। সতী গৌরী ও মেনকা, এবং শিব। সতী ও গৌরী উভয়েই ধনী মানী ঘরের মেয়ে, তাঁহাদের স্বামী শিব ধনী তো নহেনই মানীও সর্বত্র নন। ধনী শ্বশুরের ঘরে, দরিদ্র কুলীন-সন্তান জামাইয়ের মতো তাঁহার যথেষ্ট খাতির হয় নাই। সতী মনস্বিনী আত্মমর্যাদাবতী তাই জামাতা-বিদ্বেষী পিতার পিতৃত্বকে উড়াইয়া দিলেন কায়োৎসর্গ করিয়া। গৌরী নিজে পছন্দ করিয়া শিবকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঘরজামাই রূপে শিবদম্পতীর বাস মেনকার বেশিদিন ভালো লাগিবার কথা নয়। তাই সামান্য অছিলায় মানিনী গৌরী স্বামী ও সন্তান লইয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীর ঘরে দারিদ্র্য তাঁহাকে শীঘ্রই পীড়িত করিল। স্বামীর দ্বারা কিছু হইবে না দেখিয়া তিনি নিজেই সংসারের সংস্থানের জোগাড়ে বাহির হইলেন। বুঝিলেন, মানুষের পূজা পাইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। কিন্তু বড়মানুষে তখন মেয়ে-দেবতার পূজা করিত না। তাই মর্ত্য ভূমিতে মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য দেবী প্রথমে বনের পশুদের আকৃষ্ট করিয়া কিছু পূজা পাইলেন। তাহার পর তিনি বনের মানুষকে বশ করিতে প্রযত্ন করিলেন। এই হইল আখেটিক-খণ্ডের কথা। এ কাহিনীতে ফুল্লরা নায়িকা নয়, সে যেন প্রতি-নায়িকা, দেবীর প্রতিদ্বন্দ্বী। নায়ক কালকেতুর উপরেই দেবীর নজর। ফুল্লরার চরিত্র সবল ও পরিস্ফুট। স্বামী-স্ত্রীর ঘর, দরিদ্র সংসার, কিন্তু তাহার মনে অসন্তুষ্টি নাই। তাহার ইচ্ছা নয় যে কালকেতু দেবীর কাছে ধন নেয়। কৈলাসে দেব-দম্পতীর সংসার দরিদ্র এবং অসন্তুষ্ট আর কলিঙ্গের অরণ্যে ব্যাধ-দম্পতীর সংসার আরও দরিদ্র কিন্তু সন্তুষ্ট ও সুখী। গৌরীর স্বামী ধনের চেষ্টা করিতেন না তবে ধনভোগে তাঁহার অস্পৃহা ছিল না। কালকেতুর পত্নীর মনে কোনরকম লোভ তো ছিলই না উপরন্তু ধনের সম্পর্কে ভয়ই ছিল (—"সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম")।

বণিক-খণ্ডের কাহিনীতে দেখি যে দেবী নির্ভর করিতেছেন এবার নারীর উপর। খুল্লনা (=ছোট মেয়ে) বোন-সতীনের ঘরে আসিল। স্বামী যে কি বস্তু তাহা বুঝিবার আগে তাহার দিদি লহনার (লোহনা=লোভনীয় মেয়ে) সঙ্গে তাহার বিরোধ ঘটিবার কথা নয়। তবুও সে বিরোধ লাগিল, এবং তীব্র ভাবে, দাসী দুবলার (=দু-বোলার) চক্রান্তে। আখেটিক-খণ্ডের ভাঁড়ু-দত্তের মতো নিপট শঠ নয় দুবলা। সে ভাবিয়াছিল, দু-সতীনে ভাব থাকিলে তাহাকে দ্বিগুণ খাটিয়া মরিতে হইবে এবং দুপক্ষই তাহার দোষ ধরিবে। দু-সতীনে অসদ্ভাব থাকিলে সংসারে সে-ই মধ্যস্থ হইবে এবং তাহারই কর্তৃত্ব খাটিবে। তাই সে লহনাকে কানভাঙ্গানি দিয়াছিল। অকস্মাৎ খুড়তুতো ভগিনীকে বিবাহ করিয়া আনায় লহনা ক্ষুব্ধ ছিল। কিন্তু সরলহৃদয় সে পতির মিষ্ট কথায় ও অলঙ্কার দানে তুষ্ট হইয়াছিল। স্বামীর অনুপস্থিতিতে দুবলার কথায় তাহার চোখ ফুটিল। খুল্লনার বয়স অল্প, সেও বিশ্বাসী, তবে নির্বোধ নয়। ধনপতির চিঠি যে জাল তা সে পড়িয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার প্রধান গুণ সহিষ্ণুতা।

এই গুণেই সে তরিয়া গিয়াছে। সতীনের জ্বালা আর তনয়ের তাপ দুইই খুল্লনা ভোগ করিয়াছিল। তাহাই তাহার তপস্যা।

বণিক-খণ্ডের আর একটি নারী-চরিত্র উল্লেখযোগ্য, তবে সে ভূমিকার আবির্ভাব যবনিকা পড়িবার প্রায় পূর্ব মুহূর্তে, ক্ষণিকের জন্য। সিংহলের রাজকন্যা সুশীলা উজানিতে আসিয়া ঘরে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সপত্নীসংযোগ ঘটিয়া গেল। তাহার দৈব লহনার তুলনায় আরও নিষ্ঠুর। কিন্তু ভদ্র, সুবিনীত বিদেশী মেয়েটির সহজাত সৌজন্য ও সহৃদয়তা তাহার মৃদু মন্দ করুণ বচনে (এবং সিংহল ত্যাগের পূর্বে স্বামীকে আটকাইয়া রাখিবার বাগ্মিতায়) অভিব্যক্ত।

চিরকাল থাক জিয়া আর কর সাত বিয়া
শিলা মাগে সিংহলে বিদায়
বলি প্রভু শুন কাম অন্তরে নহিবে বাম
সাজন করিয়া দেহ নায়।

মুকুন্দের কাব্য পরবর্তী কালে বৈষ্ণব কবিদের ছাড়া সকল উল্লেখযোগ্য কবিকে কমবেশি প্রভাবিত করিয়া আসিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলের "কবিত্বের বিবরণ" পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী কবি যাঁহারা মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি দেবদেবীর বৃহৎ মাহাত্ম্য-আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আত্মকথায় অনুসরণ করিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের কাব্যের সমাদরের ফলে তাঁহার পর তাই খুব কম লেখকই এ কাব্য রচনার হাত দিতে সাহস করিয়াছিলেন। এইরকম একজন কবি রামানন্দ যতী, ভারতচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক। দুইশত বৎসরের প্রাচীন কবির রচনার অটুট সমাদরে এই নবীন কবি ঈর্ষান্বিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়, তাই প্রাচীন কবির প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে মুকুন্দ ইন্দ্রপুরে কাঁটাবনের অস্তিত্ব, দেবী কর্তৃক নীচ ব্যাধকে রাজত্ব দেওয়া, গুজরাটে ছাপান্ন গাঁই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বসতি, দেবীর কাঁচলিতে পশুপক্ষী চিত্রণ—ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া অন্যায় করিয়াছেন। রামানন্দ বলিয়াছেন, তাঁহার এই মত অন্য লোকেও সমর্থন করে। শিষ্য ও বন্ধুবর্গের অনুরোধে তাই তিনি মুকুন্দের দোষ সংশোধন করিয়া নূতন চণ্ডীমঙ্গল লিখিলেন।[১]

চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কি তা জায় লেখা
পাঁচালীর অমনি রচন
বুদ্ধি নাই জার ঘটে তারা বলে সত্য বটে
পথে চণ্ডী দিলা দরশন।
এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে
চণ্ডী রচে রামানন্দ যতী
অনেকের উপরোধ কেহ না করিহ ক্রোধ
অনেক শিষ্টের অনুমতি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আগেকার বাঙ্গালা সাহিত্যে কঠিন কাব্য-সমালোচনার এই একমাত্র নিদর্শন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শহরে ও সম্পন্ন পল্লীতে সাধারণ জনগণের মধ্যে অবসর সময়ে কাশীরামের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণ প্রায় নিত্য কৃত্যে পরিণত হইয়াছিল। কাশীরামের কাব্য প্রথম হইতেই পড়িবার জন্য লেখা। কৃত্তিবাসের কাব্য গাহিবার জন্য লেখা হইলেও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস কর্তৃক প্রথম ছাপা হইবার

[১] শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৬৯।

(১৮০২) পর হইতে কাশীরামের মহাভারতের মতোই যুগপৎ ধর্মকথা ও চিত্তরঞ্জন কাহিনীরূপে শ্রোতব্য গ্রন্থে পরিণত হইয়াছিল (যদিও রামায়ণ গানও খুব চলিত ছিল)। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কৃত্তিবাসের কাব্যের মতো একাধারে ধর্মকথা ও চিত্তরঞ্জক উপন্যাস, তবে গানেই প্রচলিত ছিল। শুধু মুদ্রিত হইবার বিলম্বেই (১৮২৩) যে চণ্ডীমঙ্গল মহাভারত-রামায়ণের মতো জনপ্রিয় পাঠগ্রন্থ হইতে পারে নাই তাহা নহে। রামায়ণ-গান কখনোই কোন ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ অথবা উপাঙ্গ ছিল না, কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল তা ছিল এবং ধর্মানুষ্ঠানের বাহিরে গান করিতে হইলেও ঘটস্থাপন ইত্যাদি পূজাকার্যের আড়ম্বর কিছু দেখানো হইত। এইজন্য চণ্ডীমঙ্গল রামায়ণ-মহাভারতের মতো সহজগ্রাহ্য নয়, বৈষ্ণব-পদাবলীর মতো অল্পবিস্তর ভক্ত শ্রোতার অবধানযোগ্য রচনা। এই কারণে ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে মুকুন্দের চণ্ডী-কাব্য সহসা পরিচিত হইতে পারে নাই। (বর্তমানে যতটুকু পরিচিত তা পাঠ্য পুস্তকের খাতিরেই।) এখন পর্যন্ত খুব কম স্বেচ্ছা-পাঠকই (যদি কেউ থাকেন) রচনাটিতে মনঃসংযোগ করিয়া ইহার মূল্য বুঝিতে পারিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী-কাব্য যখন প্রথম মুদ্রিত হয় তখনও পশ্চিম বঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল গানের বেশ আদর ছিল। তবে সে সমাদর ছিল সমাজের উচ্চতর, শিক্ষিত—ইংরেজীতে নহে—জনগণের মধ্যে, যেমন মনসার ভাসানের আদর ছিল সমাজের নিম্নতর, অশিক্ষিত সমাজে। ভালো চণ্ডী-গায়কের খ্যাতিপ্রতিপত্তি ভালো কীর্তন-গায়কের তুলনায় কম ছিল না। সুতরাং প্রথম মুদ্রিত চণ্ডীমঙ্গলের বটতলা কপি অথবা সংস্করণ অনতিবিলম্বে বাহির হইয়াছিল। তবে কৃত্তিবাস-কাশীরামের গ্রন্থের তুল্য কবিকঙ্কণের গ্রন্থের চাহিদা কখনোই হয় নাই। হইবার কথাও নয়, কেন না বইটিকে হালকা বলা চলে না।

ছাপা হইলে পর কবিকঙ্কণের বই কলিকাতা অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজের গোচরে আসিয়াছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ঈশ্বর গুপ্তের কলমে কবিকঙ্কণের কিছু প্রশংসা প্রত্যাশিত ছিল। তিনি অবশ্যই চণ্ডীর গান শুনিয়াছিলেন, হয়ত এ গান তাঁহার ভালোও লাগিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার রসিক মন ভারতচন্দ্রের মধুভাণ্ডে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই বৈষ্ণব পদকর্তাদের মতো কবিকঙ্কণকেও তিনি "প্রাচীন" কবিদের মধ্যে গণ্য করেন নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও সকলে মুকুন্দরামের সমজদার ছিলেন না। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে রাম-গতি ন্যায়রত্ন প্রধান ব্যতিক্রম। তিনি (১৮৭২) লিখিয়াছিলেন, "কবিকঙ্কণ বাঙ্গালা ভাষার সর্বপ্রধান কবি।"

ইংরেজী-পড়া বাঙ্গালীকে যিনি সর্বপ্রথম বিদ্যাপতি ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম শুনাইয়া সত্যকার প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন সেই মনস্বী সাহিত্যবিবেচক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখনীতেই কবিকঙ্কণ মুকুন্দের কাব্যের প্রশংসা সর্বপ্রথম বাহির হইয়াছিল। বিবিধার্থ-সংগ্রহে (১৮৫৮-৫৯) মাইকেল মধুসূদন দত্তের শর্মিষ্ঠা নাটকের সমালোচনার উপক্রমে রাজেন্দ্রলাল এই কথা লিখিয়াছিলেন

> "বাঙ্গালি কবির মধ্যে কবিকঙ্কণকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে ; যেহেতু কবির যে প্রধান ক্ষমতা কল্পনা-শক্তি তাঁহাতে যে প্রকার তাহার প্রাচুর্য্য ছিল সে প্রকার অন্যত্র লক্ষ্য হয় না ; অথচ তাঁহার সমাদর তাদৃশ প্রগাঢ় দেখা যায় না।"

রাজেন্দ্রলালের পরে কবিকঙ্কণের প্রশংসা করিয়াছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইনি চণ্ডীর গান নিশ্চয় শুনিয়াছিলেন। তদুপরি বিবিধার্থ-সংগ্রহের পাঠক, রাজেন্দ্রলালের বন্ধু, তিনি, নিজের নাটকের সমালোচনার উপক্রমণিকায় কবিকঙ্কণের প্রশংসা নিশ্চয়ই তাঁহার নজর এড়ায় নাই। পরে মাইকেলও কবিকঙ্কণের প্রশস্তি করিয়াছেন—'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'-র দুইটি কবিতায়, একটি প্রথমের দিকে ('কমলে কামিনী'), দ্বিতীয়টি শেষের দিকে ('শ্রীমন্তের টোপর')।

প্রথম কবিতায় মাইকেল লিখিয়াছেন

কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্‌দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে ?—
বঙ্গ-হ্রদ-হৃদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥

দ্বিতীয় কবিতাটির বিষয়নির্বাচনে মাইকেলের আত্মচিন্তার গতি লক্ষ্য করি। শ্রীমন্তের মতো মাইকেলও শৈশবে ও কৈশোরে প্রশ্রয়লালিত এবং অবিবেচনাশীল ছিলেন। কোটালের উত্তেজনা-বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্ত মাথার মূল্যবান্ টোপর জলে ফেলিয়া দিয়াছিল। সে টোপর দেবী শঙ্খচিল ("ক্ষেমঙ্করী") রূপ ধরিয়া ছোঁ মারিয়া ঠোঁটে তুলিয়া খুল্লনার কাছে পৌঁছিয়া দিয়াছিলেন। এই নাট্যোচিত ঘটনাটি মাইকেলের মনে দাগ কাটিয়াছিল। তিনি কবিতাটির শীর্ষে উদ্ধৃতি দিয়াছিলেন

—"শ্রীপতি—
শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর ॥" চণ্ডী।

মাইকেলের এই উদ্ধৃতি কোন বটতলা সংস্করণ অবলম্বনে, রামজয়ের সংস্করণ হইতে নয়, কেননা এই ঘটনাটুকুর কোন উল্লেখ বা ইঙ্গিত সেখানে নাই। চণ্ডীমঙ্গল হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রত্যয় দেহ যদি জানি সদাগর
তবে জানি সাধু ফেলে লক্ষের টোপর।
এত শুনি শ্রীপতি সক্রোধ অন্তর
শিরে হৈতে ফেলি দিলা লক্ষের টোপর।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর তৃতীয় ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমজদার ছিলেন বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। (অরু ও তরু দত্তের পিতা বলিয়াই এখন তাঁহার পরিচয়। ইনি সপরিবারে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।) সপরিবারে গোবিন্দচন্দ্র বিলাতে কিছুকাল কাটাইয়াছিলেন। সেইসময়ে কাওয়েল (E.B. Cowell)—যিনি আগে এদেশে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক (১৮৫৬-১৮৫৮) এবং পরে সংস্কৃত কলেজের প্রিনসিপ্যাল ছিলেন (১৮৫৮-১৮৬৪)—তখন কেম্ব্রিজে সংস্কৃতের অধ্যাপক (১৮৬৭ হইতে)। গোবিন্দচন্দ্র কিছুদিন কেম্ব্রিজে ছিলেন। সেখানে কাওয়েলের সঙ্গে আলাপে কথাপ্রসঙ্গে তিনি কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কাওয়েলের জ্ঞান-স্পৃহা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের চর্চাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আধুনিক ভাষার সাহিত্যও তাঁহার আগ্রহ ছিল। কেম্ব্রিজে গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে (অর্থাৎ সাহায্যে) চণ্ডীকাব্যের আধাআধি পড়া হইবার পর গোবিন্দচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসায় কাওয়েল নিজেই চণ্ডীমঙ্গল পাঠ চালাইতে থাকেন। কঠিন শব্দ ও ছত্র পাইলে তিনি চিঠি লিখিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে জানাইতেন। গোবিন্দচন্দ্র বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা লিখিয়া পাঠাইতেন। কাওয়েল সেই সময়ে চণ্ডীমঙ্গলের কিছু কিছু অংশ ইংরাজী অনুবাদ করিতেছিলেন। তখন তাহা ছাপাইবার কথা চিন্তা করেন নাই। অন্য কাজে তাঁহার মন পড়িয়াছিল। পরে হঠাৎ একদিন তাঁহার নজরে পড়ে গ্রীয়র্সনের একটি প্রবন্ধে এই পুরানো

বাঙ্গালা কাব্যটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।[১] তখন তাঁহার উৎসাহ পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠে এবং তিনি অনূদিত অংশটুকু এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করিতে থাকেন। কাওয়েল বলিয়াছেন যে তিনি চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত (১৮৭৮) ছাড়া আর দুইটি প্রচলিত সংস্করণ (১৮৬৭, ১৮৭৯) ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কাওয়েলের অনুবাদ তিনটি অংশের, তবে ধারাবাহিক নয়। প্রথম অংশ আখেটিক-খণ্ড হইতে—ব্যাধদম্পতী ও দেবীর সাক্ষাৎ বিবরণ, মুরারি শীলের ব্যাপার, ভাঁড়ুদত্তের কাণ্ড। দ্বিতীয় অংশ বণিক্-খণ্ড হইতে—খুল্লনার জন্ম হইতে সাধুর গৌড় হইতে প্রত্যাগমন ও খুল্লনার পুনর্বাসন পর্যন্ত। তৃতীয় অংশও বণিক-খণ্ড হইতে—খুল্লনার পরীক্ষা। ভূমিকায় "কবিত্বের বিবরণ" পদটির অনুবাদ আছে।

কাওয়েল মন্তব্য করিয়াছেন যে মুকুন্দের কল্পনার জীবন্ত বাস্তবতা তাঁহার বর্ণনায় স্থায়ী মূল্য অর্পণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের কবিদের মধ্যে মুকুন্দকে তিনি ইংরেজ কবি গ্রাবের (১৭৫৪-১৭৩১) তুল্য বলিয়াছেন। শিবের কৈলাসে হোক, ভারতভূমিতে হোক, সিংহলে হোক মুকুন্দ সর্বত্র তাঁহার প্রথমজীবনের গ্রামবাসের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা লইয়া ফিরিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত বিচিত্র চরিত্রগুলি দৃশ্যাবলীর মধ্যে চকিত দর্শন দিলেও পাঠকের মনের উপর তাহারা যেন সত্যকার জীবন ও ব্যক্তিত্বের স্থায়ী ছাপ ফেলিয়া যায়। যথার্থ বলিতে কি, কাওয়েলের কথায়, স্যর ওয়ালটার স্কটের কাছে স্কটল্যাণ্ড যা ছিল মুকুন্দের কাছে বঙ্গভূমি তাই ; গ্রামের জীবনস্মৃতি যাহা তিনি মনে মনে পোষণ করিতেন তাহা হইতে সর্বদা রচনার পাথেয় খুঁজিতেন। ভাঁড়ুদত্তের প্রসঙ্গে কাওয়েল ডিকেন্সের রচনা স্মরণ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি যেমন মুকুন্দের পক্ষে কাওয়েল ও গ্রীয়র্সনের প্রশংসালাভ প্রায় তেমনি ফলপ্রসূ হইয়াছিল। অর্থাৎ, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে মুকুন্দ এমনিই অপঠিত থাকিয়াও একজন ভালো কবি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কাওয়েলের অনুবাদ প্রকাশের পর হইতেই সাহিত্যপণ্ডিত-সমাজে মুকুন্দের কবিপ্রতিষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথ মুকুন্দের কাব্য ভালো করিয়া পড়িয়াছিলেন এবং কাব্যটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়াছিলেন। বিশ্বসাহিত্য ভাঁড়ুদত্তের যথার্থ স্থানটি রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেন (বৈশাখ ১৩১৪)

> "কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্তের যে বর্ণনা আছে সে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড়ো দিক দেখানো হইয়াছে তাহা নহে ; এই রকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লি করিতে মজবুত লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাহাদের সঙ্গ যে সুখকর তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্তিমান করিতে পারিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাষায় এমন একটি কৌতুকরস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদেরও হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত প্রত্যক্ষ সংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না। আমাদের মনের কাছে সুসহ করিবার পক্ষে ভাঁড়ুদত্তের যতটুকু আবশ্যক কবি তাহার চেয়ে বেশি কিছুই দেন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংসারের

[১] "These attempts of mine to put certain episodes of the "Chandi" into an English dress had lain for many years forgotten in desk, until I happend to read Mr. G. A. Grierson's warm encomiums on this old Bengali poem "as coming from the heart and not from the school, and as full of passages adorned with true poetry and descriptive power." ('Three Episodes from the old Bengali Poem "Chandi". Calcutta, 1903, পৃ VII—VIII দ্রষ্টব্য।)

ভাঁড়ুদত্ত ঠিক ওইটুকু মাত্র নয়, এইজন্যই সে আমাদের কাছে অমন করিয়া গোচর হইবার অবকাশ পায় না। কোনো একটা সমগ্রভাবে সে আমাদের গোচর হয় না বলিয়াই আমরা তাহাতে আনন্দ পাই না। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।"

শেষ জীবনে এক জন্মদিনের ভাষণেও রবীন্দ্রনাথ আবার ভাঁড়ুদত্তকে স্মরণ করিয়াছিলেন (সাহিত্যের স্বরূপ ১৩৫০)। লেডি ম্যাকবেথ, কিং লীয়র, অ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা, সখীপরিবৃতা শকুন্তলা ইত্যাদি বিশ্ব সাহিত্যের কয়েকটি অমর চরিত্র উল্লেখের পর তিনি বলিয়াছিলেন

"তাই বলছি, সাহিত্যের আসরে এই রূপ সৃষ্টির আসন ধ্রুব। কবিকঙ্কণের সমস্ত বাক্যরাশি কালে কালে অনাদৃত হতে পারে। কিন্তু রইল তাঁর ভাঁড়ুদত্ত। মিড্‌সামার নাইটস্ ড্রীম নাট্যের মূল্য কমে যেতে পারে, কিন্তু ফল্‌স্টাফের প্রভাব বরাবর থাকবে অবিচলিত।"

মুকুন্দের রচনা "পাঁচালী প্রবন্ধ": পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে, এবং তাহার পরেও এই ধরণের 'পাঞ্চালিকা প্রবন্ধ' ভারতবর্ষের অন্যত্র—গুজরাট-রাজস্থান অঞ্চলে—অজানা ছিল না। তবে বাঙ্গালা দেশের বাহিরের রচনাগুলিতে পূর্বতন, অলঙ্ক, অপভ্রংশ-অবহট্ট আদর্শই অনুকৃত, কোন নিজস্ব বিবর্তনের পরিচয় নাই। বাঙ্গালায়, মুকুন্দের কাব্যে তা নয়। অপভ্রংশ-অবহট্টের মূল[১] ছাড়িয়া অনেক ঊর্ধ্বে প্রসারিত হইয়াছে মুকুন্দের "নৌতন মঙ্গল"। তবে মূল হইতে যে তা বিচ্ছিন্ন নয় তাহার প্রমাণ—পেশাদারী কবি-কথকদের বর্ণনায়,—বৃক্ষবর্ণনায়, পশুপক্ষীবর্ণনায়, যুদ্ধবর্ণনায় ইত্যাদি। মুকুন্দের হাতে এইসব বর্ণনা বাক্যজালমাত্র হয় নাই। এখনকার উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের ও প্রাণি-বিদ্যায় কৌতূহলী বৈজ্ঞানিকেরা মুকুন্দের তালিকা পর্যালোচনা করিলে মূল্যবান্ তথ্য কিছু কিছু পাইতেও পারেন।

মুকুন্দের রচনার প্রশংসায় আর বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে কিছু পুনরাবৃত্তি করিয়া ভূমিকা-পালা শেষ করি। মুকুন্দের অধিকার ছিল সংস্কৃত সাহিত্যে। কালিদাসের রচনা তিনি আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল ফারসী ভাষায়। বাংলা শব্দের প্রচুর ও বিচিত্র ব্যবহারে তাঁহার জুড়ি নাই। এ বিষয়ে বলিতে পারি যে শুধু চণ্ডীমঙ্গল অবলম্বনেই পুরানো বাংলা ভাষার অভিধান সংকলিত হইতে পারে, ব্যাকরণ গঠিত হইতে পারে। (তবে সে ব্যাকরণ আধুনিক ভাষার হইতে বেশি ভিন্ন নয়।) মুকুন্দ ভক্ত এবং বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল গোলোক-বৃন্দাবনে নয় ইহলোকে নিবদ্ধ। যে দেশে ও কালে তিনি জন্মিয়াছিলেন ও বাঁচিয়াছিলেন সে জীবন ও পথের উপর তাঁহার টান ছিল। মুকুন্দের ভাবনা তাঁহার শিল্পবোধকে সংযত ও নিপুণ করিয়াছিল। চরিত্রচিত্রনে তিনি পেশাদারি বর্ণনা ফাঁদেন নাই, একটি আধটি কথায় ইঙ্গিতে ও ভঙ্গিতে তিনি ছোটখাট ক্ষণিক-দৃষ্ট পাত্রকে নিমেষে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। মুকুন্দের আঁকা ছবি—দেবতার হোক, ধনী বা নির্ধন মানুষের হোক হিংস্র বা নিরীহ পশুর হোক—সবাই নিজের ঠিক ঠিক কথা অল্পে বলিয়া গিয়াছে। সংযমের সবিশেষ দক্ষ পরিচয়

---

১ 'ফুল্লরা ও 'খুল্লনা' নাম দুইটি সরাসরি অপভ্রংশ-অবহট্ট হইতে আগত। ফুল্লরার সহিত আধুনিক বাংলা (হিন্দী হইতে আগত?) 'ফুলুরি' ও 'ফুলেল' সংপৃক্ত। 'খুল্লনা' মানে ছোট মেয়ে (ক্ষুদ্রকন্যা), খাঁটি বাংলা হইলে 'খুড়না' হইত। 'লহনা' নামটি 'লোহনা' রূপেও পাওয়া যায় (যেমন সো-পুথিতে)। এই পাঠ ঠিক হইলে নামটির মূল হয় 'লোভনা' (=লোভনীয় কন্যা)। প্রাকৃত পৈঙ্গল হইতে জানা যায় যে চতুর্দশ শতাব্দীতে অবহট্টে শিবের সংসারকাহিনীর ছড়া প্রচলিত ছিল। এমনি কিছু ছড়া মুকুন্দের হয়ত জানা ছিল। আরাণ্ডি পুথিতে দেব-খণ্ডে এক ভনিতায়ও এই ইঙ্গিত পাই,—"মুকুন্দ রচিল গৌরীর লৌকিকের ভাষা" (১৮ খ)

পাই এক ছত্রের রেখাঙ্কিত দুইটি নারীর চকিত দর্শনে।[১] ঘরে চাল বাড়ন্ত, ফুল্লরা গেল সইয়ের বাড়িতে চাল-খুদ ধার করিতে। সই বলিল, বেশ তা কালই শোধ দিয়ো—তবে এখন গোটাকত উকুন বাছিয়া দিয়া যাও।

কালি দিহ বল্যা সই কৈল অঙ্গীকার।
আইসহ প্রাণের সই বৈস গো বহিনি।
মোর মাথে গোটা কথো দেখহ উকনি।

কালকেতু সোনার-বেনের বাড়ীতে দেবীদত্ত আংটি ভাঙ্গাইতে গিয়াছে। তাহাদের কাছে মাংসের দাম কিছু পাওনা ছিল। কালকেতুর সাড়া পাইয়া বেনে খিড়কি দরজা দিয়া সরিয়া পড়িল, আর বেনেনি বলিয়া উঠিল, কর্তা ঘরে নাই, তুমি কাল আসিয়ো দাম লইতে, আর অমনি মিষ্ট কুল কিছু আনিয়া দিয়ো। "মিষ্ট কিছু আনিহ বদর"—এই কথা টুকুতেই নারীচরিত্রের স্বাভাবিক স্বার্থপরতার ক্ষণোদ্ভাস॥

[পুনশ্চ। চণ্ডীমঙ্গলের দেবী একানংসা, অরণ্যানী-দুর্গা এবং জগন্মাতা ("উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া")। কাহিনীর বিশ্লেষণে দেবীর জগন্মাতৃত্ব-রূপ উল্লেখ করা হয় নাই। মুকুন্দের কাব্যকাহিনীতে এই রূপের প্রকাশ দেখা যায় ধাত্রীরূপে দেবীর নিদয়াকে পুত্র দানে প্রসঙ্গে এবং খুল্লনার প্রসবকালে সাহায্য। শ্রীপতির মাতামহী বৃদ্ধা জরতীর ভূমিকায়ও এই ভাবের আর এক রূপ প্রকাশিত।

কালকেতুর কুটীরে সমাগত দেবী যে অরণ্যানী তাহা ঋগ্‌দেবের অরণ্যানী সূক্তের (১০-১৪৬) প্রথম শ্লোকেই বোঝা যায়। দেবী যদি গোধিকা রূপ ধারণ না করিয়া স্বরূপে কালকেতুকে অরণ্যে ছলনা করিতেন তাহা হইলে কালকেতুর প্রয়াস এই রকমই হইত। বারবার দেখা দিয়া চলিয়া যাওয়া সুন্দরী নারীর প্রতি শিকারী পুরুষের উক্তি ঃ

অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বাভীরিব বিন্দতী৺॥

'অরণ্যানি, অরণ্যানি, তুমি যে উধাও হইতেছ। গ্রামের সন্ধান কর না কেন? তোমার কি ভয় লাগে না?'

এই শ্লোকের মধ্যে যে গল্পটুকু অনুভূত হয় তাহার নায়ক হয়ত কালকেতুর মতো মৃগয়ু ছিল॥]

১ দুইটি চরিত্রই কালকেতু-উপাখ্যানে আছে। কাব্যের এই খণ্ডে মুকুন্দের লেখনীর ধার ও দীপ্তি বেশি পরিস্ফুট। মনে হয় আখেটিক-খণ্ডটি পরে লেখা হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে, দলা এবং বাঁকুড়া রায়ের উল্লেখ ধনপতি-উপাখ্যানেই পাওয়া যায়।